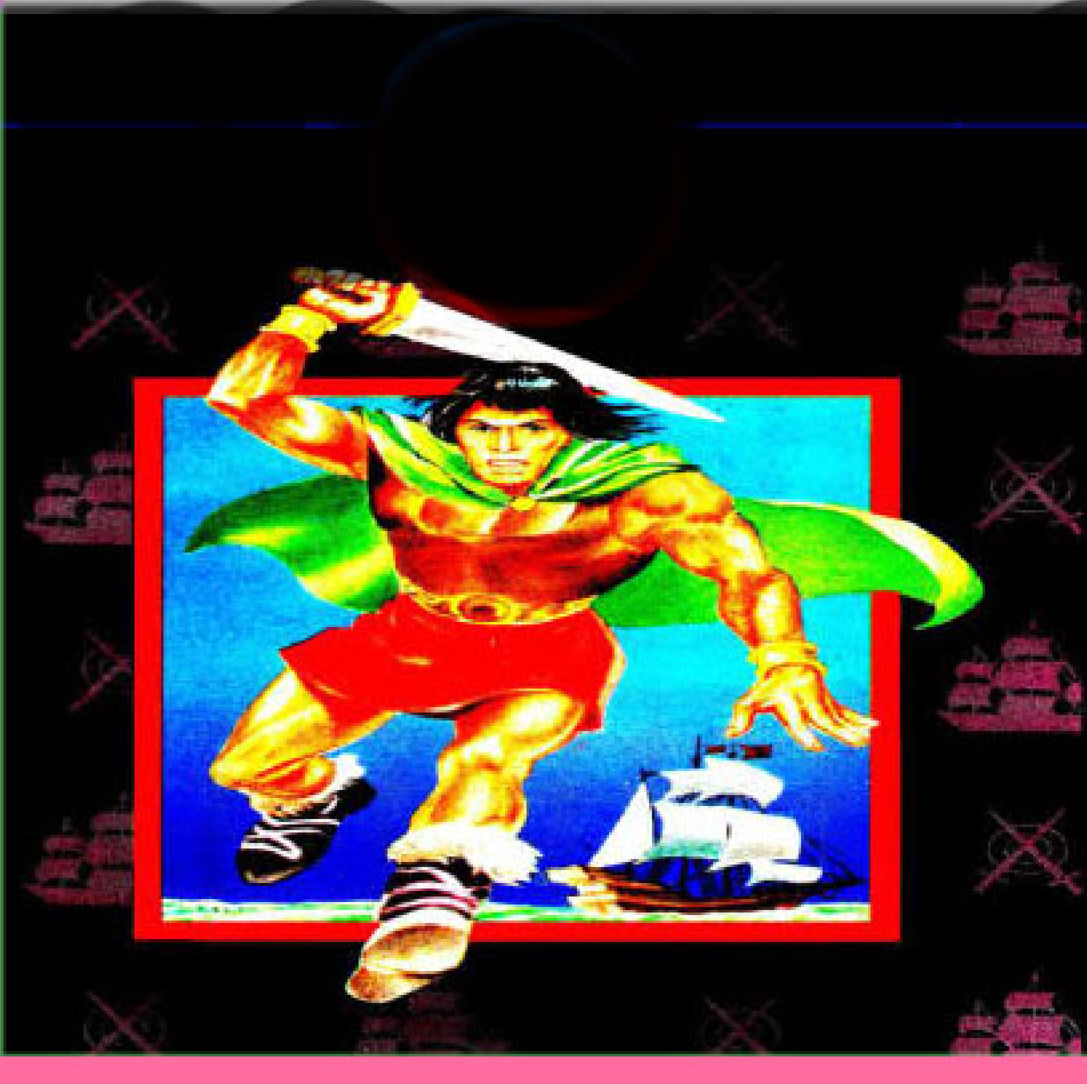
রানীর রত্নভাণ্ডার

অনিল ভৌমিক



প্রথম প্রকাশ শারদীয়া **শুকতারা** ১৪০১

রানীর রত্নভাণ্ডার

অনিল ভৌমিক

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে ওদের দেশের দিকে। ভূমধ্যসাগরের জল শান্ত। ঢেউয়ের মাতামাতি নেই। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। কতদিন পরে দেশের দিকে চলেছে ওরা।



মারিয়া অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেনি। তবে ফ্রান্সিস বেশ বুঝতে পারছিল মারিয়াও দেশে ফেরার আনন্দে অধীর। মারিয়ার দোষ নেই। ফ্রান্সিসদের মতো দেশে দেশে বিদেশ-বিভুঁইয়ের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবার অভ্যেস তো মারিয়ার নেই। কাজেই ওর আনন্দ হবে এ তো স্বাভাবিক।

জোর বাতাসে জাহাজের পাল ফুলে উঠেছে। বেশ দ্রুতগতিতে জাহাজ চলেছে। ভাইকিংদের দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ডেক-এর এখানে ওখানে কেউ কেউ শুয়ে বসে আছে। কোথাও কয়েকজন জড়ো হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। বেশ অবসরের মেজাজ সকলের।

সেদিন দুপুর থেকে কিন্তু হাওয়া পড়ে গেল। হাওয়ায় আর সেই জোর নেই। পালগুলো নেতিয়ে পড়ল। বিকেল নাগাদ জাহাজের গতি আরও কমে গেল। সমুদ্রের চারদিকে একটা গভীর স্তব্ধতা। যেন একফোঁটা হাওয়া নেই। সমুদ্রের গোঁ গোঁ ডাকও কেমন নিস্তেজ। ভাইকিংরা ঝড়ের আশঙ্কা করল। জাহাজ-চালকের কাছে এল বিস্কো। সঙ্গে দু'জন ভাইকিং বন্ধু। বিস্কো জাহাজ-চালককে বলল, কী ব্যাপার বলো তো? হাওয়া বন্ধ। চারদিক থমথমে। জাহাজ-চালকের কপালে তখন চিন্তার ভাঁজ। ও শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে ডাকো একবার। বিস্কো বলল, তা ডাকছি। কিন্তু তোমার কি আশঙ্কা প্রচণ্ড ঝড় আসবে? জাহাজ-চালক শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে খবর দাও। বিস্কো আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিপদ আশঙ্কা করে ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। জাহাজ-চালকের কাছে এসে বলল, কী হয়েছে? ঝড় আসবে? জাহাজ-চালক একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, সমুদ্রে চোরা স্রোত থাকে। আমরা সেই চোরা স্রোতে পড়েছি। আমার দিকজ্ঞান লোপ পেয়েছে। চোরা স্রোতের টান কাটাতে পারছি না। জাহাজ কোথায় চলেছে আমি জানি না।

সর্বনাশ! বলো কি? ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল। হ্যারি জাহাজ-চালককে বলল, যদি সব দাঁড় টানা যায়? জাহাজ-চালক মাথা

এপাশ-ওপাশ করল। বলল, তাহলেও এই চোরা স্রোতের প্রচণ্ড টান থেকে জাহাজকে মুক্ত করা যাবে না। জাহাজ ডুবে যাবার ভয় নেই। কিন্তু জাহাজের গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করা এখন অসম্ভব।

তবে তো আমাদের এখন কিছু করার নেই। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ, যতক্ষণ না এই চোরা টান নিস্তেজ হবে ততক্ষণ জাহাজ যেদিকে যাবে যাক। জাহাজ-চালক বলল।

এই চোরা টান কতক্ষণ চলবে? ফ্রান্সিস বলল। জাহাজ-চালক মাথা নাড়ল। বলল, জানি না। সমুদ্রের অনেক জায়গায় এরকম চোরা টান থাকে। জাহাজকে যেন টেনে নিয়ে যায়। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল—জাহাজ ডুবে যাবে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহাজ কোথায় কোনদিকে যাবে কে জানে। ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল, হ্যারি জানো, সার্দিনিয়ার ধারেকাছে কোনো দ্বীপ আছে বা মূল ভূখণ্ড কতদূর?

হ্যারি বলল, রাজকুমারী মারিয়ার ভূগোল জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। রাজকুমারী হয়তো বলতে পারবেন।



হুঁ, চলো, মারিয়াকে জিজ্ঞেস করি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল।

দু'জনে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরে এল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া চুপ করে শুয়ে আছে। এসময় মারিয়া কখনো শুয়ে থাকে না। ডেক-এ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্র আকাশ দেখে। সূর্য অস্ত গেলে কেবিনে ফিরে আসে। আজকে মারিয়া শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল, শুয়ে আছো কেন? মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। হেসে বলল, এক্ষুণি ডেক-এ যাবো ভেবেছিলাম। যাক গে, বিস্কো তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কী হয়েছে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জাহাজ-চালকের কথা, সমস্যার কথা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মারিয়া, সার্দিনিয়ার কাছাকাছি কোনো দ্বীপ বা মূল ভূখণ্ড আছে? মারিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, সার্দিনিয়ার উত্তরে আছে কর্সিকা দ্বীপ। কিন্তু সেটা কতদূরে তা আমি জানি না।

আর মূল ভূখণ্ড? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

সেটা আরো উত্তরে—দূরে। মারিয়া বলল, এটুকুই বলতে পারি।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, ডেক-এ চলো। মারিয়া হেসে বলল, এতক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে বোধহয়। আজ থাক।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ-চালকের কাছে চলল।

আসলে সকাল থেকেই মারিয়ার শরীর ভালো নেই। ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত মুখে একটা তেতো বিস্বাদ ভাব। সকালের খাবার তো খেতেই পারেনি। দুপুরেও বেশি খেতে পারেনি। ও খাবার ঘরেই খাচ্ছিল। বিস্কো পাশে বসে খাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিস্কো বলল, রাজকুমারী, আপনি যে কিছুই খেলেন না। মারিয়া হেসে বলল, খিদে পায়নি তেমন। রাতে বেশি করে খাবো। মারিয়া বিস্কোকেও বুঝতে দিল না যে ওর শরীর খারাপ।

দুপুরের দিকে মারিয়া বুঝতে পারল জ্বর এসেছে। গা হাত-পায়ের ব্যথাটা বেড়ে চলেছে। মাথায় টনটনানি শুরু হলো। মুখ বুঁজে মারিয়া সব সহ্য করতে লাগল। ফ্রান্সিস যতক্ষণ ঘরে রইল ততক্ষণ মারিয়া ফ্রান্সিসের ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছিল। ফ্রান্সিস কিছু বুঝতে পারেনি। দু'একটা কথাটথা যা বলেছে স্বাভাবিকভাবেই বলেছে। মাথার টনটনে ব্যথায় মারিয়া ছুঁচ চোখেই দেখতে পারছিল না। উল্টে মাথা নিচু করে সেলাই করতে গিয়ে মাথার ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল। তবু মারিয়া নিজের শরীরের কষ্ট ফ্রান্সিসকে বুঝতে দেয়নি। বিস্কো যখন ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল তখন আর পারল না। শুয়ে পড়ল। তখনও অল্প অল্প কাশি হচ্ছিল। বুকে একটা হাঁপ-ধরা ভাব। মারিয়া

বুঝল—বুকে কফ জমেছে। গত রাতে ডেক-এ একটু রাত পর্যন্ত ছিল। ভালো হয়নি সেটা। ঠাণ্ডা লেগেছে।

সন্ধ্যের পর থেকেই জ্বর বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে কাশিও বাড়ল। বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটাও বেড়ে চলল। মারিয়া একটা মোটা গায়ের কাপড় জড়িয়ে শুয়ে রইল। সারা শরীরে ব্যথা আর শীত শীত ভাব। কাঁপুনি। মারিয়া দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল।

বেশ রাতে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে এল। দেখল মারিয়া কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে। মারিয়া ঘুমিয়ে আছে ভেবে ফ্রান্সিস আর ডাকল না। রাঁধুনি বন্ধু মারিয়াকে রাতের খাবার খেতে ডাকতে এসেছিল। মারিয়া বলে দিয়েছিল, খিদে নেই।

হঠাৎ বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটা বাড়তেই মারিয়া কাশতে লাগল। ও উঠে বসল। কাশতে কাশতে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত দু'হাতে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। মারিয়া কাশছে তখনও। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাশিটা কমল। মারিয়া হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। দুশ্চিন্তায় ফ্রান্সিস তখনও গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না। শুধু একটু অভিমানের সুরে বলল, মারিয়া, তুমি এত অসুস্থ অথচ আমাকে একবার বললেও না। মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে বলল, সদিজ্বর এসব—ভেবো না, সেরে যাবে। ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে নামল। বলল, বিছানা থেকে নেমো না। আমি এক্ষুণি আসছি।

ফ্রান্সিস ছুটে হ্যারির কেবিন ঘরে এল। ডাকল, হ্যারি—ওঠ শীগগির। হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসের উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে হ্যারি এক লাফে বিছানা থেকে নামল। বলল, জাহাজের কিছু হয়েছে?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না। মারিয়ার ভীষণ জ্বর এসেছে। তুমি বৈদ্য ভেনকে ডাকো। আমি যাচ্ছি। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে চলে গেল। ততক্ষণে বিস্কোও উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিসের কথাও শুনেছে। হ্যারির পেছনে পেছনে বিস্কোও ছুটল বৈদ্য বন্ধুর কাছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিন ঘরে বেশ হন্তদন্ত হয়েই ভেন ঢুকল। হাতে পুঁটুলি আর চিনেমাটির বোয়াম। ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। দু'চোখ আঙুল চেপে খুলে দেখল। হাতের নাড়ি টিপে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, রাজকুমারী, পিঠটা দেখব একটু। মারিয়া একটু কষ্ট করেই উবু হয়ে শুল। মারিয়ার পিঠে বাঁ হাত পেতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ভেন ঠুকতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হলো। ঘরে আর ঘরের বাইরে অল্প জায়গায় তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস বৈদ্যকে বলল, কী বুঝলে?

বুকে ভীষণ কফ জমেছে। কষ্টের অসুখ। ওষুধ দিচ্ছি। বৈদ্য ভেন আস্তে আস্তে বলল।

খুব কাশি হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

হবেই। ওষুধ পড়ুক। দেখি। ভেন বোয়াম থেকে কালো আঠার মতো ওষুধ বের করতে করতে বলল। আঙুলে-তোলা ওষুধ হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে বড়ি মতো করল। ফ্রান্সিসকে বলল, একটা বড়ি খাইয়ে দাও। জ্বর নামবে।

বিস্কো কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিয়ে বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। মাথাটা তুলে ধরতে মারিয়া জলের সঙ্গে বড়িটা খেয়ে নিল। মারিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারল—শরীর আর ওর বশে নেই। একদিনেই শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। গায়ে হাতে পায়ে অসহ্য ব্যথা। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মাথাটা ব্যথায় টনটন করছে। ছিঁড়ে পড়ছে যেন। বুকে আবার চাপ ভাবটা বাড়তেই শুরু হলো বেদম কাশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা বেঁকে যেতে লাগল। কাশি থামাতে মারিয়া বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু কষ্টকর কাশিটা কমল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে মারিয়ার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। কাশি কমল। মারিয়া হাঁপাতে লাগল। হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মতো শক্ত মনের মানুষও অস্থির হয়ে পড়ল। ভেনকে বলল, যেভাবে পারো মারিয়ার কষ্টটা কমাও। ভেন তখন ওর কাপড়ের ঝোলা থেকে পাথরের ছোট্ট শিলনোড়া বের করেছে। বলল, দেখি। ঝোলা থেকে চারটে কালো কী ফল বের করল। দু'আঙুলে টিপে খোসাটা ভাঙল। ভেতরের সবুজ রঙের ফলগুলো বার করল। শিলনোড়া দিয়ে গুঁড়ো করল। গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে বড় গোল করল। ওটা থেকে সযত্নে ওষুধগুলো টেনে খুলে হাতে পাকিয়ে চারটে বড়ি মতো করল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ভেন বলল, ঐ কালো বড়ি খাওয়াবার এক ঘণ্টা পরে পরে এই সবুজ বড়িগুলো খাওয়াবে। হ্যারি সব বড়িগুলো নিয়ে মারিয়ার শিয়রের কাছে রাখা একটা চিনেমাটির পাত্রে রাখল।

সময় কাটতে লাগল। এক ঘণ্টা সময় গেল। হ্যারি মারিয়াকে সবুজ বড়িটা খাইয়ে দিল। আবার সকলের প্রতীক্ষা। ভেনও মাথা নিচু করে বসে রইল চোখ বুজে। কোনো কথা বলল না।

ভোর হলো। বাইরে সাগরপাখির ডাক শোনা গেল। ভেন ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কোরা তো সারারাত চোখের পাতা এক করেনি। ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ একটানা সারারাত ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝেই এসে মারিয়ার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে বারবার খোঁজ নিয়ে গেছে।

দুপুর নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হলো। প্রায় অজ্ঞানের মতো মারিয়া বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে রইল। ফ্রান্সিস অস্থির হয়ে পড়ল। বারবার ভেনকে বলল, মারিয়া কি সুস্থ হবে না? ভেন কোনো কথা বলল না। আবার নতুন ওষুধ তৈরি করল। ফ্রান্সিসই মারিয়ার মাথা তুলে ধরল। হ্যারি অনেক কষ্টে ওষুধটা খাওয়াল।

বিকেল হলো। ভেন মারিয়াকে পরীক্ষা করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে বলল, জ্বর একটু কমেছে। তবে বিপদ এখনও কাটেনি। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো সবরকম চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো ভালো বদ্যিকে আজ রাতের মধ্যেই দেখাতে হবে। নইলে—ভেন চুপ করল। ফ্রান্সিস আর বসে থাকতে পারল না। ছুটে ডেক-এ উঠে এল। দেখল—পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ও জাহাজ-চালকের কাছে ছুটে এল। বলল, যে করে হোক কোনো ডাঙায় আমাদের পৌঁছোতেই হবে। তুমি জাহাজ আরো জোরে চালাও। জাহাজ-চালক একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসকে এরকম অস্থির হয়ে পড়তে ও কোনোদিন দেখেনি। বুঝল—সত্যি কথাটা এখন বলা উচিত হবে না। ও বলল, ফ্রান্সিস অস্থির হয়ো না। স্থির হও। আমরা আজ রাতের মধ্যেই কোনো না কোনো দ্বীপে বা দেশে পৌঁছবো। তুমি রাজকুমারীর কাছে যাও। তাঁকে সাহস দাও। তুমি পাশে থাকলে রাজকুমারী মনে অনেক জোর পাবেন। তুমি যাও। আমরা যা করার করছি। ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলতে পারল না। নিজের কেবিনে ফিরে এল।

নজরদার পেড্রো গতকাল থেকেই একনাগাড়ে জাহাজের মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গায় বসে আছে। শুধু খাওয়ার সময় গোগ্রাসে খেয়েই আবার নিজের জায়গায় চলে গেছে। সারারাত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে চারদিকে যদি ডাঙা চোখে পড়ে। পরের দিনও ও নজর রাখতে লাগল।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের কারো মন ভালো নেই। ওরা শুকনো মুখে ডেক-এর এখানে ওখানে কেবিন ঘরে শুয়ে বসে সময়

কাটাতে লাগল। কিছুই তো করার নেই শুধু মারিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। শুধু শাঙ্কো রেলিঙের ধারে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে নজর রাখতে লাগল—কোনোদিকে ডাঙা দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোথায় ডাঙা? চারদিকে শুধু জল আর জল।

সন্ধ্যের পর চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। তাই জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। এতে চারদিকে নজর রাখার সুবিধে হলো।

জাহাজ চলেছে। জাহাজ-চালক হুইলে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। চোরা স্রোতের টানের জোর কমেছে। কিন্তু জাহাজ-চালক ভেবে পাচ্ছে না কোনদিকে জাহাজের মুখ ঘোরাবে। জাহাজ কোথায় এল তাও বুঝতে পারছে না। অগত্যা জাহাজ যেদিকে যায় যাক। ম্লান মুখে অসহায়ভাবে ও দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাতে হঠাৎ পেড্রোর চোখে পড়ল ডানদিকে দূরে সাদাটে কুয়াশার পাতলা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে আগুনের ক্ষীণ আভা। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল—ডাঙা—ডাঙার কাছে এসেছি আমরা। অনেক ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল রেলিঙের ধারে। বিস্কো তো ছিলই। সবাই দেখল—ক্ষীণ আলো। আলোকস্তম্ভের মতো। যেন স্তম্ভের মাথায় একসঙ্গে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। বিস্কো ছুটল ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর দিতে। জাহাজ-চালক ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ছুটে এল রেলিঙের ধারে। ওরা আলো দেখল। কিন্তু ঠিক বুঝল না ওটা সমুদ্রের বুকের আলোকস্তম্ভ কিনা। একটু পরেই বুঝল—ওটা ডাঙায় আছে। ওটা নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ বা দেশ।

ফ্রান্সিস জাহাজ-চালকের কাছে এল। বলল, যত দ্রুত সম্ভব ঐ আলো লক্ষ্য করে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, একদল দাঁড়ঘরে নেমে যাও। দাঁড় টানো। আর একদল পালের দড়িদড়া খুলে বেঁধে পাল ঠিক রাখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ আলোর কাছে আমাদের পৌঁছোতে হবে। ভাইকিং বন্ধুরা সমস্বরে হাঁক দিল—ও-হো-হো-হো। তারপর ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। জাহাজের গতি বাড়ল। জাহাজ ছুটল ঐ আলো লক্ষ্য করে।

ফ্রান্সিস কেবিন ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, একটু খোঁজখবর না নিয়ে এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো কি উচিত হবে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, হ্যারি উপায় নেই।



তরোয়াল হাতে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকে উঠে এল।

মারিয়ার শরীরের যা অবস্থা তাতে যত দ্রুত সম্ভব ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলে মারিয়াকে—আর বলতে পারল না ফ্রান্সিস। ওর গলা বুজে এল।

জাহাজঘাটের কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা বন্দর এলাকা। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। নানা দেশের পতাকা উড়ছে জাহাজগুলোর মাথায়। যে আলো ফ্রান্সিসরা দূর থেকে দেখেছিল সেই আলো জ্বলছে একটা বেশ উঁচু মিনারের মাথায়। যেন অনেকগুলো মশাল একসঙ্গে জ্বলছে। বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রে নজরদারির জন্যেই এরকম পাথর গেঁথে মিনার তৈরি করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের রেলিঙ ধরে। তাকিয়ে ছিল জাহাজঘাটার দিকে। তখনই দেখল একটা জাহাজ দ্রুত ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজটা দেখেই বুঝল ওটা যুদ্ধজাহাজ।

ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাইসব, আমরা লড়াই করবো না। কেউ তরোয়াল হাতে নেবে না। আস্তে আস্তে সব ভাইকিংরা ডেক-এ এসে দাঁড়াল। কারো মুখে কথা নেই। শুধু বিস্কো আর বৈদ্যবন্ধু ভেন রইল মারিয়ার কাছে। মারিয়া তখনও চোখ বুজে শুয়ে আছে। জ্বর কমলেও মারিয়ার শরীরে কোনো সাড় নেই। যখন কাশি উঠছে তখনই মারিয়ার কষ্ট হচ্ছে বেশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। কাশি কমলে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে থাকে।

যুদ্ধজাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা জোর

ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। যুদ্ধজাহাজ থেকে জনা দশেক সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকে উঠে এল। সর্বপ্রথমে যে উঠে এল সে ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সেই দলনেতা। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মুখে দাড়ি গোঁফ। লম্বা টান টান শরীর। সৈন্যদের গায়ে হাঁটুঝুল মোটা কাপড়ের পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম নেই। কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধ। তাতে তরোয়ালের খাপ গোঁজা।

দলনেতা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে পো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমরা তো এই অঞ্চলের লোক নও। তোমরা এখানে এসেছ কেন? হ্যারি এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা পো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বলল, আপনার অনুমান ঠিক। আমরা বিদেশী, জাতিতে ভাইকিং আমরা। আমাদের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর সুচিকিৎসার জন্যে আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শান্তি চাই—যুদ্ধ চাই না। দলনেতা একটু ভাবল। তারপর বলল, শুধু তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস নেই। আমরা জাহাজ তল্লাশী করবো। তোমরা দস্যু লুটেরার দল হতে পারো। হ্যারি ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল, ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিও না। হ্যারি বলল, আপনি জাহাজ তল্লাশী করুন—আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে জেনে রাখুন আমরা জলদস্যু নই। আমরা ভাইকিং—বীরের জাতি। দলনেতা এসব কথায় বিশেষ কান দিল না। সঙ্গের সৈন্যদের ইঙ্গিত করল জাহাজ তল্লাশীর জন্যে। চারজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। দুজন সৈন্য ডেক-এ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। হ্যারি বলল, এটা কি কোনো দ্বীপ না দেশ?

এটা কর্সিকা দ্বীপ। এই বন্দরের নাম বোনিফেসিও—কর্সিকার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বন্দর। এখানকার সামন্ত রাজা সিনার্কা। দলনেতা বলল। হ্যারি সব কথা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর দলপতিকে বলল, তল্লাশী শেষ হলেই বুঝবেন আমরা জলদস্যু বা লুটেরার দল নই। আমাদের দেশের রাজকুমারী এই জাহাজে সাংঘাতিক অসুখে মৃতপ্রায়। আমাদের বিনীত অনুরোধ—আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হলেই যত শীগগির সম্ভব রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সে সব মাননীয় সিনার্কাকে বলবেন কাল সকালে। দলনেতা বলল। হ্যারি বলল, না, কাল সকালে নয়। আজ রাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দলপতি বেশ কড়া চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল, একটু পরেই সবাইকে কয়েদঘরে ঢুকতে হবে। তার জন্যে তৈরি হোন। হ্যারি চিৎকার করে বলে উঠল, আমাদের নরকে নিয়ে যান—কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে হবে। হ্যারিকে ক্রুদ্ধস্বরে এভাবে চিৎকার করে কথা বলতে ভাইকিং বন্ধুরা কখনও দেখেনি। ওরা বেশ আশ্চর্য হলো। হ্যারি ও দলপতির কথা ওরা না বুঝলেও হ্যারিকে সমর্থন জানাতে ওরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-হো। ভাইকিংদের এভাবে উত্তেজিত হতে দেখে দলপতি বেশ ঘাবড়ে গেল। তবু গাম্ভীর্যভাব বজায় রেখে বলল, মাননীয় সিনার্কা উত্তরে শারিনে গিয়েছেন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। উনি কাল সকালে ফিরবেন। তখন উনিই যা করবার করবেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, হ্যারি, এখন একেবারেই উত্তেজিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কাজ করতে হবে।

কিন্তু ফ্রান্সিস, বৈদ্য বলেছে আজ রাতের মধ্যেই সুচিকিৎসা চাই—নতুন ওষুধ চাই। হ্যারি বলল।

জানি জানি। দেখা যাক দলপতি কী করে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রের মৃদু গর্জন আর শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। যারা তল্লাশী চালাচ্ছিল তারা দলপতির কাছে এল। ওরা বলল, জাহাজে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু একজন অসুস্থ মহিলার ঘরে কিছু গয়নাগাঁটি পাওয়া গেছে। তেমন মূল্যবান কিছু জাহাজে লুকানো নেই। দলপতি একবার মাথা ঝাঁকাল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, এই জাহাজটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বন্দরে চলো। তারপর যা করার করবো।

দলপতি নিজেদের যুদ্ধজাহাজে চলে গেল। তার সৈন্যরা কয়েকজন মিলে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের যুদ্ধজাহাজের পেছনের হালের সঙ্গে শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধল। তারপর টেনে নিয়ে চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

শাঙ্কো, ফ্রান্সিস আর বৈদ্য ভেন-এর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরেছিল আজ রাতের মধ্যেই মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলে মারিয়ার বাঁচার আশা কম। তাই শাঙ্কো জাহাজ থেকে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। তখনই সৈন্যরা জাহাজের তল্লাশী সেরে দলপতিকে সব জানাচ্ছিল। শাঙ্কো দেখল—এই সুযোগ। সৈন্যরা সব দলপতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে নজর নেই। ও আস্তে আস্তে নিজেদের দল থেকে সরে এল। গলা নামিয়ে হ্যারিকে বলল, হ্যারি আমি পালাচ্ছি। তারপর ডেক-এর ওপর নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে চলে এল। তারপরই সিঁড়িঘর। সিঁড়িঘরের আড়ালে আড়ালে গড়িয়ে চলে এল পেছনে হালের কাছে। ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নেমে এল জলের ওপর। আস্তে জলে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। দম বন্ধ করে ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা ভাসাল। দেখল, সেই সৈন্যরা কয়েকজন ওদের জাহাজের হালের সঙ্গে কাছি বাঁধছে। শাঙ্কো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যাক সময়মতোই পালানো গেছে। আর একটু দেরি হলে ও ধরা পড়ে যেত। শাঙ্কো জলে শব্দ না তুলে আস্তে আস্তে ওদের জাহাজের পেছনে পেছনে সাঁতরে চলল।

বোনিফেসিও বন্দরের ঘাটে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজ লাগল। দলপতির নির্দেশে সৈন্যরা কাঠের পাটাতন ফেলল। ফ্রান্সিসরা তখনও বুঝতে পারছে না দলপতি ওদের নিয়ে কি করবে।

এবার দলপতি ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। পাটাতনের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে নামতে হবে। তুমি সবাইকে নেমে আসতে বলো। হ্যারি বলল, আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের রাজকুমারী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে অন্তত এই জাহাজে থাকতে দিন। পাহারা দিয়েই রাখুন। দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, না না—সবাইকে দুর্গে যেতে হবে। ওসব অসুখ-বিসুখ বুঝি না। হ্যারি, ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, এখন ওর কথা শুনে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ও যা বলছে তাই করতে হবে।

কিন্তু সাংঘাতিক অসুস্থ রাজকুমারীকে—

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমিই মারিয়াকে নিয়ে যাবো। দলপতির আদেশ মেনে চললে হয়তো মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঐ দলপতিই করে দেবে। দলপতি চিৎকার করে বলল, কী হলো? নামো সবাই।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, সবাইকে নামতে বলো। আমি মারিয়াকে নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল। হ্যারি এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই জাহাজ থেকে নেমে এসো। আমি জানি—এভাবে আমরা কখনো বিনা লড়াইয়ে বিনা প্রতিবাদে হার স্বীকার করি না। কিন্তু আজকের অবস্থা অন্যরকম। ফ্রান্সিস বলেছে দলপতি যা

বলে তাই মেনে নিতে। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। দলপতি হ্যারির দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, এক্ষুনি সবাইকে নামতে বলো। নইলে সব ক'জনকে আমরা মেরে ফেলবো। হ্যারি কথাটা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল। ভাইকিংদের গুঞ্জন থামল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস অনেক ভেবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সিসের কথার অবাধ্য হয়ো না। এতক্ষণে ভাইকিংরা আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে জাহাজঘাটায় নামতে লাগল। ওরা বুঝল রাজকুমারী অসুস্থ। তার চিকিৎসার দরকার সবার আগে।

ওদিকে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে ঢুকে দেখল—বৈদ্য ভেন মাথা নিচু করে মারিয়ার মাথার কাছে বসে আছে। ফ্রান্সিস বৈদ্যকে ডাকল। তারপর আস্তে আস্তে সব কথা বলল। বৈদ্য ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। গলায় হাত দিল। বলল, জ্বর বেশি নেই। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। এ অবস্থায় রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়া খুব ঝুঁকি। ফ্রান্সিস বলল, উপায় নেই। এই ঝুঁকি নিতেই হবে। মাথা নিচু করে মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে ফ্রান্সিস ডাকল, মারিয়া। মারিয়া কোনো সাড়া দিল না। ফ্রান্সিস আবার ডাকল, মারিয়া। মারিয়া আস্তে আস্তে চোখ খুলল। একটু হাসার চেষ্টা করল। কোনো কথা বলতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া তোমাকে সব পরে বলবো। এখন আমাদের সবাইকে তীরে নামতে হবে। তোমাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবো। যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয় তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। শুধু তুমি একটু কষ্ট হলে সহ্য কোরো। পারবে তো? মারিয়া খুব আস্তে আস্তে মাথা কাত করলো। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

মারিয়ার কাঁধের পেছনে হাত দিয়ে মাথাটা তুলল। হাঁটুর নিচে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে বিছানা থেকে তুলল। তারপর বেশ আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলল। পেছন না ফিরে বলল, ভেন তোমার দরকারি ওষুধগুলো আনতে ভুলো না।

মারিয়াকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ ওঠার সময় বেশ অসুবিধে হলো ফ্রান্সিসের। অনেক আস্তে অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও ঝাঁকুনি লাগল। মারিয়ার মুখে কষ্টের শব্দ হলো—উঃ উঃ। মারিয়া কপাল কোঁচকাল। চোখ বন্ধই রইল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার সাবধানে উঠতে লাগল।

কাঠের পাটাতনের সামনে এসে দেখল—বন্ধুরা আস্তে আস্তে সোজা রাস্তাটা দিয়ে চলেছে। সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা পাহারা দিয়ে চলেছে। এসময় মারিয়ার হঠাৎ কাশি উঠল। ফ্রান্সিস বেশ ঘাবড়ে গেল। কাশি হলেই মারিয়ার কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা যেন বেঁকে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস বহুকষ্টে মারিয়াকে ধরে থাকল। মুখ ঘুরিয়ে বৈদ্যকে ডাকল, ভেন—শীগগির এসো। বৈদ্য ভেন ছুটে এল। মারিয়ার পিঠে দুহাতের তালু চেপে চেপে ধরল। কাশি কমল। ফ্রান্সিস তবু নড়ল না। কাশি থেমে গেল। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ওর চোখমুখ কুঁচকে গেল। মারিয়ার রোগার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মনটা হাহাকার করে উঠল। এত কষ্টের জীবন মারিয়ার সহ্য হবে না—এটা ওর আগে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এখন ওসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগল। ওর চোখেমুখে তখন সংকল্পের দৃঢ়তা।

মিনার ছাড়িয়ে দলপতির পেছনে পেছনে সৈন্যদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা চলল। পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলল। দুপাশে ছাড়া ছাড়া পাথরের বাড়িঘর নিস্তব্ধ। এত রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সবাই একটা দুর্গের সামনে এল। দুর্গের সদর দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে। পাহারাদার সৈন্যরা দলপতিকে দেখে মাথা একটু নোয়ালো। পাহারাদারের সঙ্গে কী কথা হলো। ঘড় ঘড় শব্দে বিরাট কাঠের দরজাটা খোলা হলো। সবাই দুর্গের মধ্যে ঢুকল।

একটা পাথর বাঁধানো ছোট চত্বরের পরে একটা দরজার সামনে এসে সবাই দাঁড়াল। লোহার গরাদের দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। দলপতির নির্দেশে একজন এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খুলল। ঠং ঠাং শব্দে দরজা খোলা হলো। দলপতি হ্যারিকে বলল, সবাইকে ভেতরে ঢুকতে বলো। হ্যারি বলল, কিন্তু আমাদের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ। তাঁকে অন্তত রেহাই দিন। দলপতি মাথা নেড়ে বলল, সেসব কাল সকালে সিনার্ককে বলবেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বলল, আর কোনো অনুরোধ করো না। দেখা যাক কী হয়।

ঘরটা বেশ বড়। পাথুরে দেয়ালের আংটায় মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল ঘর জুড়ে দড়িবাঁধা শুকনো ঘাসের বিছানামতো। তার ওপর মোটা কাপড় পাতা। প্রায় দশ বারো জন লোক শুয়ে আছে তাতে। ফ্রান্সিস বুঝল—ওরা বন্দী। এটা কয়েদঘর। ও মারিয়াকে নিয়ে ডানদিকে দেয়ালের কাছে এসে বিছানায় আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়ার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বৈদ্য ভেন মারিয়ার একপাশে বসল। হাতের পুঁটুলি রাখল পাশে। হ্যারি এসে বসল ফ্রান্সিসের কাছে। আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, শাঙ্কো জলে নেমে পালিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো কি জানে আমাদের এখানে বন্দী করা হয়েছে?

আমি জাহাজ থেকে নামার সময় গলা চড়িয়ে দুবার বলেছি—শাঙ্কো আমাদের অনুসরণ করো। হ্যারি বলল।

যাক, একজন তো বাইরে রইলো। ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল।

হ্যারি ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। কয়েকজন হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। অবশ্য কথা বলার মতো মনের অবস্থা এখন ওদের নেই। একদিকে রাজকুমারীর এই অবস্থা অন্যদিকে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ—ওরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হ্যারিরা আসার আগে যে বন্দীরা ছিল তাদের দেখা গেল সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাদের পরনে এই অঞ্চলের চাষীদের জোব্বামতো পোশাক। শুধু একজন পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মশালের আলো ওখানে অল্পই পৌঁছেছে। হ্যারি আবছা দেখল লোকটির পরনের পোশাক একইরকম তবে রঙটা ঘন নীল। একটু দামী ভালো কাপড়ের পোশাক। লোকটির মাথার এলোমেলো বড় বড় চুল কপালে নেমে এসেছে। মুখে পাতলা দাড়ি গোঁফ। কতদিন এখানে বন্দী হয়ে আছে কে জানে। হ্যারি ওপরের দিকে তাকাল। পাথরের ছাদ। ডানদিকে ছাদের একটু নিচে মনে হলো একটা ফোকরমতো। তাতে গরাদ নেই। ফোকরের জায়গাটা পাথর ভেঙে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এত উঁচুতে যে দেয়াল বেয়ে অতদূর পৌঁছানো অসম্ভব।

হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, ভেন দ্যাখো তো। মনে হচ্ছে মারিয়ার জ্বরটা বেড়েছে। ভেন এগিয়ে এল। মারিয়ার কপালে গলায় হাত চাপল। বলল, একটা ওষুধ খাওয়াতে হবে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, একপাত্র জলের ব্যবস্থা কর। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বন্ধুদের কাউকে ডাকল না। কিন্তু জল কোথায়? হ্যারি চারদিকে তাকাল। বোধহয় হ্যারিকে চারিদিকে তাকাতে দেখেই প্রায় অন্ধকার থেকে লোকটি স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি কিছু খুঁজছেন? বেশ ভারি গলা

লোকটির। হ্যারি একটু দ্রুতই শায়িতদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকটির কাছে এল। বলল, একজন অসুস্থকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। জল কোথায় রাখা আছে? লোকটি আঙুল তুলে বাঁ দিকের কোণটা দেখাল। বলল, ওখানে একটা বাড়তি কাঠের পাত্রও আছে। হ্যারি চলল সেই দিকে।

একটু পরেই জল নিয়ে ফিরে এল। ভেন ততক্ষণে ওর ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে বড়ি বানিয়েছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার নিচে হাত দিল। মৃদুস্বরে বলল, মারিয়া একটা ওষুধ খেয়ে নাও। তারপর হাত দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করল। ভেন বড়িটা হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি জল আর বড়িটা আস্তে আস্তে মারিয়াকে খাইয়ে দিল। মাথা নামিয়ে দিতেই মারিয়া গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল। কপালে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আস্তে আস্তে মারিয়ার গোঙানি বন্ধ হলো।

হ্যারি চুপ করে বসেছিল। শরীর ক্লান্ত। ঘুমে চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দিকে চোখ পড়তে হ্যারি আর ঘুমের কথা ভাবতেই পারছিল না। হঠাৎ হ্যারি শুনল, আপনাদের মধ্যে অসুস্থ কে? হ্যারি মুখ ফিরিয়ে দেখল সেই লোকটি ওদের কাছে চলে এসেছে। হ্যারি হাত তুলে মারিয়াকে দেখাল। লোকটি বেশ আশ্চর্য হলো মারিয়াকে দেখে। বলল, ইনি তো মহিলা। তার ওপর অসুস্থ। সিনার্কার সৈন্যরা এঁকেও বন্দী করল? হ্যারি বলল, ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

আপনারা বিদেশী। লোকটি বলল।

হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। হ্যারি বলল।

আমার নাম রোক্কা। লোকটি বলল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে হ্যারি বলল, ও ফ্রান্সিস—রাজকুমারীর স্বামী। আমি হ্যারি। রোক্কা একটু মাথা নুইয়ে নিয়ে এ অঞ্চলের ভদ্রতা দেখাল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। হ্যারি ভাবল রোক্কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো যাবে। জেগেও থাকা যাবে। বলল রোক্কা, আপনাদের এই বন্দীদশার কারণ কী?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি—সিনার্কা জেনো। জেনোয়ার অধিবাসীদের আমরা জেনো বলি। কর্সিকার এই দক্ষিণ অঞ্চলে সিনার্কা তার রাজত্ব কায়েম করেছে। দরিদ্র চাষী জেলেদের ওপর তার অত্যাচার নিপীড়নের শেষ নেই। আমরা তাই সিনার্কার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমাদের শক্ত ঘাঁটি হলো কিছু উত্তরে সারিন-এ। এখানে সব চাষী জেলেদের বিদ্রোহী করে তুলতে আমরা এসেছিলাম। সামান্য ভুলের জন্য ধরা পড়ি। মাস ছয়েক আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে সিনার্কা ও তাঁর তাঁবেদার ভূস্বামীদের কর্সিকা থেকে তাড়াবো। রোক্কা থামল। তারপর মারিয়ার চিকিৎসা কী হচ্ছে, হ্যারিরা কেন এখানে এসেছে এসব নিয়ে রোক্কা হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

শাঙ্কো সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে কখনো আস্তে আস্তে সাঁতরে সমুদ্রতীরে এল। জল থেকে উঠে শাঙ্কো বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে রাস্তার ধারে এল। পাথুরে দেয়ালের আড়াল থেকে দেখল—ফ্রান্সিসরা দুর্গে ঢুকল। বুঝল, এখানে নিশ্চয়ই কোনো কয়েদঘর আছে। ফ্রান্সিসদের সেখানেই বন্দী করা হলো।

শাঙ্কো কিছুদূরের একটা চেস্টনাট গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় দুর্গটা দেখতে লাগল। দেখে বুঝল—দুর্গটা পুরনো। তবে এদিকটা সারাই করে দেউড়িতে কাঠের দরজা বসানো হয়েছে। শাঙ্কো বুঝল এখান দিয়ে দুর্গে ঢোকা যাবে না। শাঙ্কো চলল দুর্গটার পেছন দিকে।

দুর্গটা ঘুরে শাঙ্কো দুর্গটার পেছনদিকে এল। দেখল—পেছন দিকে পাথুরে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দুর্গের এই ভাঙা অংশটার নিচেই একটা খাদমতো। খুব গভীর খাদ নয়। খাদটায় গাছপালার জঙ্গল। এদিকটায় দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপ। সেই ভাঙা পাথরের স্তূপ জমে জমে দুর্গটার প্রায় মাথার কাছে উঠে গেছে। চাঁদের আলোয় ঐ দিকে ভালো করে নজর দিয়েও কোনো প্রহরীকে দেখল না। বুঝল—এদিক দিয়ে কেউ দুর্গে ঢুকতে পারবে না বলেই এদিকটা অরক্ষিত হয়ে আছে।

এবার শাঙ্কো খাদের বড় বড় গাছগুলোর মাথা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখতে পেল তাতে বুঝতে পারল ঐ বড় বড় গাছগাছালি বেয়ে উঠে পাথরের স্তূপের কাছে যাওয়া যাবে। তারপর ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে দুর্গের অনেকটা ওপরে ওঠা যাবে।

শাঙ্কো দ্রুত কাজে নামল। খাদটার গায়ে গায়ে পাথরের এবড়োখেবড়ো চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে একটা বড় বেশ উঁচুতে ডালপালা ছড়ানো ওক গাছের নিচে এল। তারপর উঁচুতে ঝুঁকেপড়া ডাল দেখে হিসেব করল। গাছটায় উঠতে লাগল। ডালপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে সেই আলোই শাঙ্কোর ভরসা। একসময় ওক গাছটার মগডালে উঠে এল। ডালটা ধরে ধরে অন্য একটা মোটা ডালে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপের কাছে এল। শাঙ্কো তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। গাছটার কাণ্ড বেয়ে বেয়েও ওকে উঠতে হয়েছে অনেকটা। একটু অপেক্ষা করে দম নিল। তারপর ঐ ডালটা ছেড়ে দিয়ে পাথরের স্তূপের ওপর নেমে এল। এখানে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। ও সাবধানে ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে দুর্গের ওপরে উঠতে লাগল। তখনই দেখল বাঁ দিকে পাথরের ভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ফ্রান্সিসদের কোন ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে শাঙ্কো তো জানে না তা। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে কিছুটা নামতেই দেখল ডানহাতি একটা জানালার মতো ফোকর। তবে ভাঙা। শাঙ্কো দেখল ভাঙা সিঁড়িগুলো থেকে ফোকরটা সাত-আট হাত দূরে। এই ফাঁকটা পার হবার উপায় নেই। শাঙ্কো ওখান থেকেই দু'হাতের চেটো মুখের কাছে গোল করে ফোকরের দিকে মুখ এগিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। ফোকরের নিচের কয়েদঘরে তখন হ্যারি আর রোক্কা মৃদুস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। ওরা সেই ডাক শুনতে পেল না। কিন্তু ফ্রান্সিস ডাকটা অস্পষ্ট শুনল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কান পাতল। হ্যারি আর রোক্কা কথা থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার একটু স্পষ্ট ডাক শোনা গেল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। হ্যারি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল, নিশ্চয়ই শাঙ্কো।

কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে শাঙ্কো? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল। হ্যারি আঙুল দিয়ে ছাদের কাছে ভাঙা জানালাটা দেখিয়ে বলল—ঐখান থেকে শাঙ্কো ডাকছে। ফ্রান্সিসও দু'হাতের চেটো গোল করে বলল—শাঙ্কো—আমরা এই ঘরে। ভাঙা জানালার নিচে শাঙ্কোর কথা শোনা গেল, অপেক্ষা কর। আমি দড়ি নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস হ্যারি রোক্কা তিনজনেই কথাটা শুনল। রোক্কা বলল, কে কথা বলছে?

আমাদের এক বন্ধু—শাঙ্কো। ও যদি ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিতে পারে তাহলে আমরা দড়ি বেয়ে উঠে ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে পালাতে পারবো। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হলো—যাক ফ্রান্সিসদের পাওয়া গেছে ভাঙা জানালার নিচের ঘরটাতে। শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে লাগল। ওক গাছটার কাছে এসে লাফিয়ে উঠে মগডালটা ধরল। তারপর গাছ থেকে কখনও ডাল ধরে ধরে কখনও কাণ্ড বেয়ে বেয়ে দ্রুত

নিচে নেমে এল। ছুটল জাহাজঘাটের দিকে। জাহাজ থেকে মোটা কাছি আনতে হবে।

রাস্তা দিয়ে নয়—শাঙ্কো বাড়িঘরগুলোর আড়ালে গাছ ঝোপ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটে এল জাহাজঘাটে। চাঁদের আলোয় দেখল—নোঙরকরা ওদের জাহাজটাকে মাঝখানে রেখে দুটো যুদ্ধজাহাজ—এখানে যুদ্ধজাহাজকে বলে ফেলুকা। সৈন্যদের হাঁটুঝুল কাপড়ের পোশাককে বলে কাপট। শাঙ্কো ঠিক করল ওদের জাহাজ থেকেই লম্বা কাছি আর দড়ির মই নেবে। তার আগে ফেলুকা দুটোর নোঙরের দড়ি কেটে দিতে হবে যাতে ফেলুকা দুটো বাতাসের ধাক্কায় আস্তে আস্তে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যায়। বাতাস সমুদ্রের দিকেই বইছে। আস্তে আস্তে ফেলুকা দুটো ভেসে গেলে ভেতরের সৈন্যরা বুঝতেই পারবে না।

শাঙ্কো দেখল জাহাজঘাটের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। নজরদার মিনারের ওপারের আগুনও এখন স্তিমিত। একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে শাঙ্কো সেখান দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে সমুদ্রের জলে নামল। জলে কোনো শব্দ না তুলে চলল বাঁদিকের ফেলুকার দিকে। ফেলুকার কাছে এসে চাঁদের আলোয় দেখল—মাত্র একজন কাপটপরা সৈন্য ডেক-এ ঘোরাফেরা করছে। শাঙ্কো জলে ডুব দিয়ে ফেলুকার নোঙরবাঁধা কাছিটার কাছে আস্তে জল থেকে মাথা তুলল। তারপর কোমর থেকে ছোরাটা খুলল। ধারালো ছোরার কয়েকটা পোঁচেই নোঙরের কাছি কেটে গেল। ফেলুকাটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল গভীর সমুদ্রের দিকে।

শাঙ্কো কোমরে ছোরা গুঁজে এ পাশের ফেলুকার দিকে নিঃশব্দে জল ঠেলে চলল। নোঙরের কাছির কাছে এল। কাছিটা দেখে ওর মনে হলো এই কাছিটাই নিয়ে গেলে ভালো হয়। ও এই কথা ভেবে জলে ডুব দিল। কাছিটার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে বেশ নিচে নেমে এল। তারপর ছোরা বের করে পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে কাছিটা কাটল। কোমরে ছোরা গুঁজে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। তখনই নজরে পড়ল ফেলুকাটার পেছনে হালের কাছে মইটা ঝুলছে। কাঠের ছোট ছোট ধাপবাঁধা দড়ির মইটা বেশ শক্তপোক্ত। ওদের দড়ির মইয়ের চেয়ে অনেক ভালো আর লম্বাও।

শাঙ্কো ফেলুকার পেছনে হালের কাছে নিঃশব্দে এল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পায়ের ভর রেখে রেখে পেছনের ডেক-এ উঠে এল। ছোরা বের করল। দ্রুত হাতে মইটা যে লম্বা দড়ি দিয়ে হালের সঙ্গে বাঁধা সেটা কেটে ফেলল। নোঙরের বাঁধা কাছিটা কেটে ছোরাটা কোমরে গুঁজল। কাটা কাছির মুখটা কোমরে জড়ানো। তারপর দড়ির মইয়ের মুখের দড়িটা হাতে নিয়ে হালের মইয়ের প্রথম ফাঁকটায় বাঁ হাত গলিয়ে কাঁধে আটকে নিল। কাছির মুখটাও বাঁ হাতে ধরল। ডান হাতটা দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল তীরের দিকে। মই আর লম্বা কাছি টেনে আনতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তবে দূরত্ব কম বলে কিছু পরেই সব নিয়ে তীরে উঠল। কাছির সবটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। শাঙ্কোর শরীর দেখাল পিপের মতো। মইটা দ্রুত হাতে উল্টো করে করে গুটিয়ে কাঁধে ফেলে শাঙ্কো চলল সেই দুর্গের পেছন দিকে। এতক্ষণে সমুদ্রের জোর হাওয়ায় শাঙ্কোর জলে-ভেজা শরীর শীত শীত করে উঠল। একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। সমুদ্রের ওপর পাতলা সাদাটে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল ফেলুকা দুটো অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছে।

দুর্গের পেছনে যখন এল তখন আকাশের দিকে তাকাল—রাত শেষ হতে কত দেরি? দেখল—চাঁদ আর তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বুঝল—রাত বেশি নেই। শাঙ্কোরা তো জাহাজে জাহাজেই ঘুরে বেড়ায়। দিন রাতের আকাশ দেখে ওরা মোটামুটি সময় হিসেব করতে পারে।

কাছি আর মই নিয়ে বেশ কসরৎ করে শাঙ্কো এক গাছটার ডাল থেকে পাথরের স্তূপের ওপর নামল। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ভাঙা সিঁড়িগুলোর কাছে এল। তারপর আগের মতই হাতের তেলো গোল করে ডাকল, ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে। উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিস তখন ভাবছে—শাঙ্কো কি ওদের পালাবার উপায় বের করতে পারবে? শাঙ্কোর ডাক শুনেই ফ্রান্সিস আগের মতোই বলল, শাঙ্কো? শাঙ্কো তখন চাঁদের ম্লান আলোয় চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল দুটো বড় বড় পাথরের পাটাতন সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। শাঙ্কো মইয়ের একমুখের টানা দড়িটা দিয়ে পাথর দুটোয় পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর মইয়ের অন্য মুখটা দুহাতে ছুঁড়ে দিল ভাঙা জানালার ফোকরের দিকে। কিন্তু ফোকর দিয়ে গলে গেল না মইয়ের মাথাটা। পাথরে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ তুলে নিচে গড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো সাবধান হলো। কোনোরকম শব্দ হওয়া চলবে না। মইয়ের মুখটা টেনে তুলল। বার কয়েক মইয়ের মাথাটা শূন্যে ঘুরিয়ে জোরে ছুঁড়ে দিল ভাঙা ফোকরটার দিকে। এবার মুখটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে গলে গেল। শাঙ্কো মইটা ছাড়তে লাগল। মইয়ের মাথাটা নিচে নামতে নামতে মেঝের কাছে চলে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি বোক্কা তিনজনেই ছুটে এল মইয়ের কাছে। ফ্রান্সিস মইয়ের মাথাটা কয়েকবার জোরে টানল। দেখল মইটা যথেষ্ট শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। এবার ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ডাকল মারিয়া—মারিয়া। মারিয়া চোখ খুলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমরা পালাব। তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু দাঁত চেপে তোমাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে। কোনোরকম শব্দ করবে না। মারিয়া ঠোঁট একটু ফাঁক করে দুর্বলস্বরে বলল—আচ্ছা।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে পিঠ আর হাঁটুর কাছে ধরে ধরে ঘাসের বিছানা থেকে তুলল। তারপর মারিয়াকে বাঁ কাঁধে শুইয়ে নিল। এই ঝাঁকুনিটা যত কমই হোক আর ফ্রান্সিস সাবধান থাকা সত্ত্বেও মারিয়ার কাশি এল। শুরু হলো মারিয়ার দমবন্ধ-করা কাশি। ভেন তাড়াতাড়ি মারিয়ার পিঠে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস এক পাও নড়ল না। মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে মারিয়া কাশলে ভয়ের কিছু নেই। মারিয়া এর আগেও কেশেছে—পাহারাদার সৈন্যরা শুনতেও পেয়েছে। কিন্তু ঐ ভাঙা জানালার কাছে উঠে কাশলেই বিপদ হবে। সেই কাশির শব্দ পাহারাদারদের কানে গেলে ওদের সন্দেহ হবেই। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। এই কয়েদঘর থেকে মুক্তির আর কোনো আশাই থাকবে না।

মারিয়ার কাশি কমল। তবু ফ্রান্সিস নড়ল না। মশালের আলোয় হ্যারি দেখল—দুচোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঘামে-ভেজা মুখ মশালের আলোয় চকচক করছে। একদিকে মারিয়ার জন্যে দুশ্চিন্তা অন্যদিকে পালাবার এই সুবর্ণ সুযোগ এবং শেষ সুযোগ—ফ্রান্সিসের মনে কী ঝড়ের তোলপাড় চলছে হ্যারি সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারল। মারিয়ার কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে মইয়ের দিকে এগোল। মইয়ের কাঠে পা রেখে রেখে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ততক্ষণে ভাইকিংরা বোক্কার বিদ্রোহী অনুচরেরা সবাই জেগে গেছে। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল ফ্রান্সিস কী অসীম ধৈর্য আর মনের জোরে সব কষ্ট সহ্য করে এক-পা এক-পা করে মই দিয়ে উঠছে। ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজনের চোখে জল এল। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল—ফ্রান্সিস যেন সফল হয়।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়াকে নিয়ে উঠতে লাগল। একসময় ভাঙা জানালার ফোকরের

নিচের পাথরে পা রাখল। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে দু'পায়ে দাঁড়াল। সামনে তাকিয়ে দেখল আরো আট-দশ হাত ফাঁক। তার ওপর মইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের ধাপ। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দাঁড়াল। ও হাঁপাচ্ছে তখন। পিঠে মারিয়ার নাক-মুখ দিয়ে গরম শ্বাস পড়ছে। শরীরও গরম। বেশ জ্বর। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে মাকে স্মরণ করল। ও যেন দেখতে পেল মার সেই হাসিমুখ। কী পবিত্র মার হাসি। ফ্রান্সিসের মনের জোর বেড়ে গেল। ও চোখ খুলে নিচু হলো। প্রায় হামা দিয়ে কাঠের ধাপগুলোয় কখনো হাঁটু কখনো পায়ের পাতা রেখে আস্তে আস্তে ভাঙা সিঁড়িতে উঠে এল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে বসল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে শাঙ্কোর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, মারিয়া। মারিয়া মুখে শব্দ করল, উঁ।

তোমার কষ্ট হয়নি তো? মারিয়া কোনো কথা বলল না। কিন্তু ফ্রান্সিস স্পষ্ট বুঝল—ওর পিঠে জল গড়িয়ে পড়ছে। মারিয়া নিঃশব্দে কাঁদছে। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। শাঙ্কো এগিয়ে চলেছে। ফ্রান্সিস ওর পিছু পিছু চলল ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে। নইলে যে-কোনো মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে।

শাঙ্কো তো জায়গাটা চেনে। ও ফ্রান্সিসের আগেই খাদের ধারে চলে এল। এখানেই ও কাছিটা কোমর থেকে খুলে রেখেছিল। কাছির একটা মুখ টেনে বাঁধলো একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে। তারপর কাছিটা খাদে ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ততক্ষণে এসে পড়েছে। শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, আমিই না হয় রাজকুমারীকে কাঁধে নিয়ে নামি। ফ্রান্সিস শুধু বলল, আমি পারবো। তারপর মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরল। বলল, মারিয়া এবার কষ্ট হলেও আমাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরো। মারিয়া দুর্বল শরীরে আর কতটা জোর পাবে। তবু জোরে আঁকড়ে ধরল ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস বলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরো জোরে ধরো। একটুক্ষণ। আমরা মুক্তির দোর-গোড়ায়। মারিয়া আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ফ্রান্সিস খাদের ওঁচানো পাথরে পা রেখে রেখে কাছি বেয়ে বেয়ে বেশ দ্রুতই নেমে এল। বুঝল—মারিয়া এত জোরে বেশিক্ষণ ধরে থাকতে পারবে না। এখানটায় পাথর কম। ম্লান চাঁদের আলোয় একটা ঘাস-ঝোপে-ঢাকা জায়গায় মারিয়াকে শুইয়ে দিল। তারপর পাশে নিজে শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

কয়েদঘরের সবাই এতক্ষণ ফ্রান্সিসের মই বেয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখছিল। হ্যারি যখন বুঝল মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস পালাতে পেরেছে তখন রোক্কার দিকে তাকাল। বলল, রোক্কা, ফ্রান্সিস নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এখন আপনাকে সবার আগে পালাতে হবে। পালিয়ে গিয়ে প্রথম আপনাকে রাজকুমারীর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখন রাজকুমারীকে সুস্থ করে তোলার আগে পর্যন্ত আমরা কিছু ভাবতে পারছি না। আমাদের কারো মনে এখন শান্তি নেই। রোক্কা একটু ভাবল। বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন।

ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই অসুস্থ রাজকুমারীকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। কারণ, ফ্রান্সিস এখানকার কিছুই চেনে না। হ্যারি বলল।

খুবই স্বাভাবিক। রোক্কা বলল। একটু ভেবে নিয়ে রোক্কা বলল, কিন্তু আর দেরি করা যাবে না। রোক্কা এবার দু'হাত ওপরে তুলে নিঃশব্দে হাতের ইঙ্গিতে সবাইকে কাছে আসতে বলল। সবাই এসে রোক্কাকে ঘিরে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াল। রোক্কা লো ল্যাতিন ভাষায় নিজের দলের লোকেদের বলল, বন্ধুরা এরা ভাইকিং—বিদেশী। এই কর্সিকা দ্বীপের কিছুই ওঁরা চেনেন না। তোমরা ওঁদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে এই আমার নির্দেশ। কারণ—এঁদের যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি এঁরা শুধু সৎ ও বিবেকবান নন—বীর ও দুঃসাহসী। একটু থামল রোক্কা। তারপর বলল, আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না। তোমরা এই ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে বার্গ পাহাড়ে আমাদের আস্তানায় চলে যাবে। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রোক্কা থামল। তারপর হ্যারিকে বলল, আপনি আপনার বন্ধুদের আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলে দেবেন। এবার সবাই পালাবার জন্যে তৈরি হও। বলেই রোক্কা মইটার কাছে গেল। মই বেয়ে দ্রুত উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলল, কোনো গোলমাল যেন না হয়। রোক্কা মই বেয়ে উঠে ফাঁকের জায়গাটা পার হয়ে ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর এল। শাঙ্কো একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে চারদিকে নজর রাখছিল। এবার এগিয়ে এসে ঝোলানো কাছিটা আঙুল দিয়ে দেখাল। রোক্কা দ্রুত কাছি বেয়ে খাদে নামল। ফ্রান্সিস রোক্কাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। রোক্কা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজকুমারীকে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো। মারিয়াকে আস্তে আস্তে দু'হাতে তুলে পাঁজাকোলা করে রোক্কার পেছনে পেছনে চলল। তখনই দেখল, পুব আকাশে লাল রং ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। চিন্তা হলো বন্ধুরা সূর্য ওঠার আগেই পালাতে পারবে কিনা। কিন্তু এখন আর ফিরে বন্ধুদের সাহায্য করার কথা ভাবতে পারল না। মারিয়ার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বসতি এলাকা এড়িয়ে রোক্কা ঝোপঝাড় পাথুরে এলাকা দিয়ে চলল। পেছনে মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিসও যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রোক্কা একটা কাঠ আর পাথরে তৈরি বাড়ির পেছনে এল। পেছনে পাথরের দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের দরজা। রোক্কা দরজাটায় বার-কয়েক ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। সাধারণ পোশাকপরা একটি যুবক মুখ বাড়িয়ে রোক্কাকে দেখে হাসল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। রোক্কা ফ্রান্সিসকে ইশারা করে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসও ঢুকল। রোক্কা দুপাশের ঘর ছাড়িয়ে টানা বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরটায় এল। কয়েকটা কাঠের তক্তা পেতে বিছানা করা। বালিশও আছে। রোক্কা ফ্রান্সিসকে হাতের ইঙ্গিতে মারিয়াকে শুইয়ে দিতে বলল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। রোক্কা সেই ছেলেটিকে বলল, শীগগির বৈদ্যমশাইকে আসতে বলো। যুবকটি ছুটে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তক্তাপাতা বিছানায় বসল। হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। মারিয়া চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো লাল। ফ্রান্সিস উৎকণ্ঠিতস্বরে বলল, মারিয়া—মারিয়া—কী হয়েছে? মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ও বুঝে উঠতে পারল না কী করবে এখন? মারিয়া চোখ বুঁজল। অসাড় শুয়ে রইল।

রোক্কার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক ঢুকলেন। তাঁর গায়ে রোক্কার মতোই দামী পোশাক। তিনি বেশ দ্রুতই বিছানায় বসলেন। মারিয়ার কপালে হাত দিলেন। চোখ টিপে ধরে চোখের নিচটা দেখলেন। গোড়ালির কাছে হাত দিয়ে টিপে ধরলেন। রোক্কাকে বললেন, রোগীকে একটু পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও। লো ল্যাতিন ভাষা। ফ্রান্সিস বুঝল না। রোক্কা স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসকে বলল কথাটা। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বলল, বৈদ্যমশাই তোমাকে পরীক্ষা করবেন। একটু পাশ ফিরে শোও। মারিয়া পাশ ফিরতে গেলে ফ্রান্সিস সাহায্য করল। বৈদ্যমশাই মারিয়ার পিঠে আঙুল পেতে অন্য আঙুলে বেশ কয়েকবার ঠুকলেন। ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে সোজা করে শোয়াতে বললেন। যুবকটিকে কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। তারপর চুপ করে বসে রইলেন। কেউ কোনো কথা বলল না।

একটু পরে যুবকটি একটা ছোট চিনেমাটির বাটিতে সবজে রঙের জল নিয়ে এল। তখনই

মারিয়ার কাশি উঠল। আবার সেই কষ্ট, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে কাশতে কাশতে। ফ্রান্সিস অসহায়ের মতো মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাশি কমল। একটু পরে কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বৈদ্যর মুখের দিকে তাকাল। দেখল বৈদ্যমশাইয়ের কপালে চিন্তার রেখা। উনি একদৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে ওষুধটা খাইয়ে দিতে বললেন। ফ্রান্সিস ওষুধের বাটিটা মারিয়ার মুখের কাছে এনে বলল, মারিয়া একটু কষ্ট করে এই ওষুধটা খাও। অসুখ সারবে। ফ্রান্সিস বাঁ হাতে মারিয়ার মাথাটা তুলে ধরল। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ওষুধটা খেয়ে নিল। মুখ বিকৃত করল। বোঝা গেল ওষুধটা বিস্বাদ। মাথাটা বালিশে নামাল ফ্রান্সিস। বৈদ্যমশাই একটুক্ষণ বসে থেকে উঠলেন। মৃদুস্বরে যুবকটিকে কী নির্দেশ দিলেন। এবার রোক্কা জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন? বৈদ্যমশাই লো ল্যাতিন ভাষায় বললেন, নিশ্চয়ই আগে কিছু ওষুধ পড়েছিল। নইলে উনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতেন। বৈদ্যমশাই চলে গেলেন। উৎকণ্ঠিত ফ্রান্সিস বলল, রোক্কা, বৈদ্যমশাই কী বললেন? রোক্কা একটু হেসে বলল, বললেন অসুখ সেরে যাবে। তবে কয়েকদিন ওষুধ পড়তে হবে। ফ্রান্সিস একটু আশ্বস্ত হলো। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝল না মারিয়া কথাটা শুনেছে কি না।

যুবকটি একটি মোটা কাপড় নিয়ে এল। মারিয়ার গায়ে ঢাকা দিল গলা পর্যন্ত। তারপর চলে গেল। রোক্কা বলল, আমি একটু আসছি। রোক্কা চলে গেল। একা ফ্রান্সিস মারিয়ার শিয়রে বসে রইল। ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল, বন্ধুরা কেউ তো জানতেই পারল না আমরা এখানে আছি। রোক্কাকে বলতে হবে ওদের খবর দেবার জন্যে।

ওদিকে কয়েদঘর থেকে রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যরা আর ভাইকিংরা মই বেয়ে পালাতে লাগল। ভাইকিংরা দশ-পনের জন আর কয়েকজন রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্য পালিয়েছে তখন। এত জনের নড়াচড়া মই বেয়ে ওঠায় বেশ শব্দ হতে লাগল। পাহারাদার জেনো সৈন্যদের সন্দেহ হলো। ওরা লোহার দরজা খুলে দ্রুত কয়েদঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় মই দেখেই ওরা বুঝল কিছু কয়েদী পালিয়েছে। রোক্কাও পালিয়েছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য নিরস্ত্র ভাইকিংদের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিংরা কয়েকজন আহত হলো। অন্য সৈন্য দু'জন তরোয়াল চালিয়ে চালিয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিল। বাকি ভাইকিংদের আর রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যদের একজনেরও পালানো হলো না। কয়েদঘরে তালা লাগিয়ে পাহারাদার সৈন্যরা চলে গেল।

ভাঙা সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিল শাঙ্কো। কয়েদঘরে গোলমাল, পাহারাদার সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনেই বুঝল—ওরা টের পেয়েছে। বোধহয় মইয়ের দড়িও কেটে দিয়েছে। আর কারো পালানোর সম্ভাবনা নেই।

শাঙ্কো ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব খাদে নেমে এল। মুক্ত বন্ধুরা এসে শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কো বলল, বন্ধুরা, এখনও সব বন্ধু পালাতে পারেনি। পাহারাদার সৈন্যরা টের পেয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিয়েছে। এক্ষুণি আমাদের জাহাজে যেতে হবে। অস্ত্র এনে লড়াই করে বাকি বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে। হ্যারি বলল, কিন্তু জেনো সৈন্যদের যুদ্ধজাহাজ দুটো আমাদের জাহাজের দুপাশেই রয়েছে। শাঙ্কো একটু হেসে বলল, আমি দুটো জাহাজেরই নোঙর-বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছি। দুটো জাহাজই এখন মাঝ-সমুদ্রে। এখানকার পাহারাদার আর কিছু সৈন্য হয়তো এখন আছে। ওদের লড়াই করে হারাতে অসুবিধে হবে না। এই সুযোগ। আর দেরি নয়। সব জাহাজঘাটায় চলো।

ওরা দল বেঁধে ছুটল জাহাজঘাটার দিকে। শাঙ্কো যে পাথুরে মাটি ঝোপঝাড়ের এলাকা দিয়ে জাহাজঘাটায় এসেছিল সেই জায়গা দিয়েই বন্ধুদের নিয়ে চলল।

জাহাজঘাটায় এসে চাঁদের আলোয় দেখল সত্যি শুধু ওদের জাহাজটাই ভাসছে। জেনোদের যুদ্ধজাহাজ দুটো নেই। বোঝা গেল—ঐ দুই জাহাজের সৈন্যরা এখনও বোধহয় বুঝতে পারেনি যে ওদের জাহাজ জাহাজঘাটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

শাঙ্কো হ্যারিরা দ্রুত কাঠের পাটাতন দিয়ে ওদের জাহাজে উঠল। দ্রুত ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে।

তরোয়াল নিয়ে ওরা ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কো নিয়ে এল ওর তীর ধনুক।

জাহাজ থেকে নামতেই দেখল তিনচারজন জেনো সৈন্য জাহাজঘাটার দিকে ছুটে আসছে। ওরা বোধহয় ওদের ফেলুকা মানে যুদ্ধজাহাজ দেখতে না পেয়েই ছুটে আসছিল।

সামনেই অস্ত্রহাতে শাঙ্কোরা। শুরু হলো লড়াই। তখন চাঁদ আর তারার আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। ভোর হতে দেরি নেই। লড়াই চলল। বিস্কোর নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে জেনো সৈন্যরা বুঝল এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনজন জেনো সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গোঙাতে লাগল। শেষেরটির হাতের তরোয়াল বিস্কোর একটা জোরালো মার ঠেকাতে গিয়ে তখন ছিটকে গেছে। সেই সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দুর্গের দিকে।

দুর্গের সামনে যখন ওরা এলো তখন সকালের রোদ পড়েছে দুর্গের পাথুরে গায়ে। কাছে এসে দেখল সদর দেউড়ির সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জেনো সৈন্যরা আট-দশ জন দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে সেই দলপতি। হ্যারি চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, শাঙ্কো, পায়ে তীর ছুঁড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল কর। বুকে মেরো না। বন্ধুদের উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য—অকারণ নরহত্যা আমরা চাই না।

শাঙ্কো পাথুরে রাস্তায় বাঁ হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর নিশানা স্থির করে তীর ছুঁড়ল দলপতির দিকে। দলপতি তরোয়াল ফেলে দু'হাতে হাঁটু চেপে বসে পড়ল। শাঙ্কো আর একটা তীর ছুঁড়ল। ওটা দুর্গের কাঠের দরজায় গিয়ে বিঁধে গেল। আবার দ্রুতহাতে তীর ছুঁড়ল শাঙ্কো। আর একজন সৈন্যের ডান হাতে লাগল তীরটি। সে তরোয়াল ফেলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরল। এবার জেনো সৈন্যদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে পালাতে লাগল দুর্গের ডানপাশে। একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না। গাছগাছালির আড়াল দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল ওরা।

হ্যারি সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে দুর্গের সদর দেউড়িতে এল। দেখল বিরাট কাঠের দরজাটা একটু খোলা। তার মানে ভেতরের কয়েদঘরের পাহারাদার সৈন্যরাও এসেছিল বাধা দিতে। শাঙ্কোর তীরে আহত একজন পাহারাদার সৈন্যের কোমরে ঝোলানো আংটায় কয়েদঘরের চাবি পাওয়া গেল। হ্যারি চাবি নিয়ে দরজা পার হয়ে কয়েদঘরের দিকে ছুটল। পেছনে বন্ধুরা।

কয়েদঘরের তালা খুলল হ্যারি। তারপর জোরে ধাক্কা দিয়ে লোহার দরজা খুলেই চিৎকার করে বলল, বন্ধুরা পালিয়ে এসো। বন্দী ভাইকিংরা ছুটে এল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। সবাই ছুটে দুর্গের বাইরে এল। এবার কোথায় যাবে ওরা? হ্যারি দেখল রোক্কার একজন বিদ্রোহী সৈন্য মাত্র মুক্ত বন্ধুদের দলে আছে। হ্যারি ছুটতে ছুটতে সেই সৈন্যটিকে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, রোক্কা আমাদের যেতে বলেছে তোমাদের বার্গ পাহাড়ের আস্তানায়। আমাদের সেখানে নিয়ে



তীর ছুড়ল দলপতির দিকে।

চলো। সৈন্যটি বলল, রোক্কার নির্দেশ মানার জন্যেই আমি আগে পালাইনি। চলুন। কিন্তু সদর রাস্তা দিয়ে নয়। অন্যদিক দিয়ে যেতে হবে। সেই সৈন্যটি সবার সামনে এসে ছুটতে লাগল।

পাথর ছড়ানো অসমতল জায়গা দিয়ে, পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে ওরা ছুটতে লাগল বার্গ পাহাড়ের দিকে।

বেশ কিছুটা আসার পর দূর থেকে দেখল ওরা ধুলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে কারা যেন আসছে। সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকে বলল, সবাইকে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়তে বলুন। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে কথাটা বলেই নিজেও একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। সবাই এখানে-ওখানে ছোটো ঝোপঝাড়ের আড়ালে শুয়ে পড়ল।

দূর থেকে প্রথমে সিনার্কার শকটটা দেখা গেল। তারপর অশ্বারোহী সৈন্যরা। পরে পদাতিক সৈন্যরা। স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু সৈন্যটি সিনার্কার শকট দেখেই চিনল। সিনার্কার সৈন্যরা চলে যেতে বিদ্রোহী সৈন্যটি হ্যারিকে বলল, বোধহয় সারিনের লড়াইয়ে সিনার্কা আমাদের সৈন্যদের কাছে হেরে গেছে।

আবার ছোটা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরে দূরে একটা ছোটো পাহাড় দেখিয়ে রোক্কার সৈন্যটি বলল, ঐ যে বার্গ পাহাড়। দেখা গেল পাহাড়টায় গাছগাছালি বিশেষ নেই। হ্যারিরা চলল ঐ বার্গ পাহাড় লক্ষ্য করে।

বেলা বাড়তে লাগল। যুবকটি হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইঙ্গিতে ওষুধটা মারিয়াকে দিতে হবে জানাল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিল। বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মাথাটি তুলে ধরল। যুবকটি মারিয়াকে একটু জল খাওয়াল। তারপর শুকনো পাতায় মোড়া দু'টো কালো রঙের বড়ি বের করল। মারিয়াকে খাইয়ে দিল। তারপর আবার জল খাওয়াল। মারিয়া পাত্রের সবটা জলই খেয়ে ফেলল। বোঝা গেল ওর যথেষ্ট জল তেষ্টা পেয়েছিল।

তখনই রোক্কা ঘরে ঢুকল। বলল, ফ্রান্সিস, আপনি ও রাজকুমারী এ বাড়িতেই থাকবেন। বেলা হলো। আপনি খেতে চলুন। ফ্রান্সিস আস্তে বলল, মারিয়া তো না খেয়ে আছে। ওকে আগে কিছু খেতে দিন। রোক্কা যুবকটিকে বলল সে কথা। যুবকটি কী বলে চলে গেল। রোক্কা বলল, রাজকুমারীকে এখন শক্ত খাবার খেতে দেওয়া হবে না। স্যুপ, ফলের রস এসব এই যুবকটিই খেতে দেবে।

তাহলে মারিয়ার খাওয়া হোক। তারপর আমি খাবো। ফ্রান্সিস বলল। তখনই যুবকটি দুটো বড় চিনেমাটির বাটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকল। হেসে রোক্কাকে কী বলল। রোক্কা খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। হাসতে হাসতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, সারিনে আমার বিদ্রোহী বন্ধুদের কাছে যুদ্ধে হেরে গেছে সিনার্কা। সিনার্কা পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসছে। কথাটা বলে রোক্কা ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রান্সিসের তখন এসব ভাববার মতো মনের অবস্থা নেই। ও মারিয়াকে তখন ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসাল। পিঠে ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরে থাকল। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, একটু খেয়ে নাও। মারিয়া বন্ধ চোখ খুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার চোখের সেই লালচে ভাবটা নেই। গায়ের গরম ভাবটা অনেক কম। যুবকটি আস্তে আস্তে মারিয়াকে স্যুপ আর ফলের রস খাইয়ে দিল। মারিয়াকে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়া চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল।

তখনই রাস্তায় শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। লোকজনের কথাবার্তা। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। রোক্কার পেছনে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। একটা ছাদখোলা ঘোড়ায় টানা শকট আসছে। শকটটা কালো রঙের। তাতে রুপোলি লতাপাতা ফুলের কাজ করা। শকটে বসে আছে একজন প্রৌঢ়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল এলোমেলো। কপালে নেমে এসেছে। গায়ে বেশ দামী কাপড়ের হলুদ রঙা জোব্বামতো। বেশ ধুলো কাদা লেগে আছে পোশাকে। গম্ভীর থমথমে মুখে বসে আছে প্রৌঢ় লোকটি। রোক্কা ফিসফিস করে বলল, এখানকার সামন্তরাজা সিনার্কা। আস্তে আস্তে শকটটা চলে গেল। পেছনে পাঁচ ছ'টা ঘোড়ায় চড়া জেনো সৈন্য। কাপড়-পরা। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মুখ-চোখ সৈন্যদের। তাদের পেছনে পদাতিক সৈন্যরা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা সব। পোশাক ছেঁড়া। ধুলো-কাদা মাখা। আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে গেল ওরা। ফ্রান্সিস দরজার কাছ থেকে সরে এল।

বিকেল নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা অনেকটা ভালো হলো। যুবকটি এসে মারিয়াকে ওষুধ খাওয়াল। মারিয়া ওষুধ খাওয়ার সময়

চোখ খুলে উঠে বসে ওষুধ খেল। যুবকটি মারিয়ার কপালে গলায় হাত বুলিয়ে হেসে ফ্রান্সিসকে বলল, এখন উনি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ফ্রান্সিস কথাটা বুঝল না। সেই লাতিন ভাষা। তবে যুবককে হাসতে দেখে বুঝল মারিয়া ভালো আছে। যুবকটি চলে গেল। রোক্কা তখনও ফিরে আসেনি।

সন্ধ্যের সময় বৈদ্যমশাই এলেন। সঙ্গে রোক্কা আর সেই যুবকটি। বৈদ্যমশাই মারিয়াকে পরীক্ষা করে রোক্কার দিকে হেসে তাকালেন। বললেন, এত তাড়াতাড়ি উনি বিপদ কাটিয়ে উঠবেন ভাবিনি। যা হোক—আর কোনো ভয় নেই। খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম। দু'তিন দিনের মধ্যেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। রোক্কা হেসে কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আনন্দে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দ্রুত এগিয়ে এসে বৈদ্যমশাইয়ের ডানহাতটা নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে মাথা নোয়াল। অনেক কষ্টে চোখের জল আটকাল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখল মারিয়া খুশি চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

বৈদ্যমশাই মৃদুস্বরে যুবকটিকে কী নির্দেশ দিলেন। তারপর চলে গেলেন। যুবকটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ফ্রান্সিস এবার রোক্কাকে বলল, কিন্তু আমার বন্ধুরা কি জানে আমরা এখানে আছি?

সব খবর তাদের দেওয়া হয়েছে। শুধু আপনাদের রাজকুমারী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এই খবরটা এখনও দেওয়া হয়নি। এই খবরটা আমিই দিতে যাবো। আপনারা বিদেশী। সবাইয়ের এখানে আসাটা সিনার্কার সৈন্যদের নজরে পড়লে বিপদ হবে। সার্বিনের যুদ্ধে হেরে ওরা রেগে আগুন হয়ে আছে। রোক্কা বলল।

তাহলে এক কাজ করুন—শুধু হ্যারি নামের আমার বন্ধুটিকে আপনি আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রোক্কা বলল। তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যে হলো। যুবকটি একটি রুপোর মোমবাতিদানে বসানো মোটা হলুদ রঙের জ্বলন্ত মোমবাতি ঘরে রেখে গেল। ফ্রান্সিস তখনও মারিয়ার বিছানার পাশে বসে মারিয়ার ডান হাতটা ধরে আছে। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। বেশ স্বাভাবিকভাবেই মারিয়া দু'একটা কথা বলছে তখন।

একটু রাত হলে হ্যারিকে নিয়ে রোক্কা ঘরে ঢুকল। হ্যারি ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া দুর্বলস্বরে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যারি এত খুশি হলো যে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, হ্যারি, মারিয়ার বিপদ কেটে গেছে। হ্যারি আনন্দে কোনো কথা বলতে পারল না।

হ্যারি আর রোক্কা মারিয়ার বিছানার পাশে বসল। রোক্কা বলল, রাজকুমারী এখন কেমন আছেন? মারিয়া অল্প হেসে বলল, অনেকটা ভালো।

ভালো হতেই হবে। সারা কর্সিকায় এই বৈদ্যমশাইয়ের যে কী সুনাম আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। রোক্কা বলল। মারিয়া একটু হেসে বলল, এই কর্সিকা দ্বীপকে পুরনো দিনের নাবিকরা বলত 'সুগন্ধিয়া দ্বীপ'। তাই না? রোক্কা বেশ আশ্চর্য হলো। বলল, কত দূরে আপনাদের দেশ অথচ এই ছোট্ট দ্বীপটার কথাও আপনি জানেন দেখছি। আপনি সত্যিই বিদুষী। মারিয়া হেসে বলল, না-না—তেমন কি আর। আমাদের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থ আছে। সে সব পড়েই জেনেছি। একটু থেমে মারিয়া বলল, তবে কর্সিকার অতীত ইতিহাসে দেখা গেছে বিভিন্ন শক্তিমান জাতি শত্রু হিসেবে এই কর্সিকাকে আক্রমণ করেছে। কেউই বন্ধু হিসেবে আসেনি।

ঠিক বলেছেন—রোক্কা মাথা ওঠানামা করে বলল। তারপর বলল, কর্সিকাবাসীদের জীবনে তাই বোধহয় বন্ধুত্ব ভালোবাসার স্থানটা কম। আমাদের জীবনে মৃত্যুটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেনদেত্তা কথাটা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন।

হ্যাঁ—খুনোখুনির বদলা নেওয়া। মারিয়া বলল।

ঠিক। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বংশের সবাইকে হত্যা করা এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে পেশাদার কাঁদুনেরা আছে। তাদের ভাড়া করে আনা হয়। মৃতের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁদে। আমাদের গানও তাই বোধহয় বড় বিষাদের।

সকলেই চুপ করে রইল। রোক্কার কণ্ঠস্বরে যে বেদনার সুর ছিল তা ফ্রান্সিসদের মন স্পর্শ করল। ওরা আর কথা বলতে পারল না। রোক্কা একটু পরে বলল, একজন রানীর কাহিনী আপনাদের বলি। তাঁর নাম ইসাবেলা। প্রায় একশো বছর আগের কথা। এই দক্ষিণ কর্সিকার রাজা ছিলেন তখন দ্বিতীয় জেমস। এখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের জন্যে মূল ভূখণ্ডের জেনোয়া ও পিসার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল



একটা ছাদখোলা ঘোড়ায় টানা শকট আসছে।

অনেক কাল ধরে। দ্বিতীয় জেমস এই দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে জেনোয়াবাসী ও পিসাবাসীদের এখানকার অনেক অংশ দিয়ে দিয়েছিলেন। সিনার্কারা ছিল জেনো মানে জেনোয়ার অধিবাসী। আজকের সিনার্কাদের পূর্বপুরুষরা তখন এখানে ঘাঁটি গাড়ে। রাজা দ্বিতীয় জেমসের সঙ্গে তার আত্মীয়দের এক পারিবারিক বিবাদে সিনার্কারা রাজার শত্রু আত্মীয়দের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল। রাজা দ্বিতীয় জেমসের রানী ইসাবেলা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন শুধু রাজার আর তাঁর জীবন নয়, তাঁদের একমাত্র কন্যারও জীবন বিপন্ন। তাছাড়া পুরুষানুক্রমে রাজা জেমস এবং রানী ইসাবেলার ছিল অতি মূল্যবান রত্নালংকার। কেউ জানে না কতগুলো অলংকার। তবে লোক-প্রচলিত কাহিনী বলে তার সংখ্যা নাকি অনেক। সিনার্কাদের তীব্র লোভ ছিল সেই রত্নভাণ্ডারের দিকে। রোক্কা থামল।

তারপর? মারিয়া বলল। রোক্কা বলতে লাগল, রানী ইসাবেলা একদিন বোনিফেসিওর ঐ দুর্গে যার নিচের কয়েদঘরে আমরা বন্দী ছিলাম—সেই দুর্গে গেলেন। ওপরের দিকের দুটি কক্ষ দেখলেন এবং সেইদিন থেকেই তাঁর নির্দেশে ঐ দুইটির একটি কক্ষে খাদ্য, আনাজপত্র এবং দীর্ঘদিনেও নষ্ট হয় না এমন মাকুয়েস-দানা, সেজ আলু, জলপাই প্রচুর রাখা হলো। সেইসঙ্গে জলের বেশ বড় কয়েকটি পিপে। খুবই গোপনে বিশ্বস্ত কিছু প্রাসাদরক্ষীরা করল এসব। তারপর একদিন গভীর রাত্রে রানী তাঁর ঘুমন্ত কন্যাকে নিয়ে দুর্গের সেই কক্ষ দুইটির একটিতে আশ্রয় নিলেন। কথা ছিল রাজা জেমসও রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা একত্র করে সেই কক্ষে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু শেষ রাতে সিনার্কারা অর্থ দিয়ে প্রাসাদরক্ষীদের বশীভূত করে জেনো সৈন্যদের নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজা জেমস বন্দী হলেন। হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। হয়তো তাঁকে জেনোয়ায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হতো। কিন্তু ঐ যে বললাম, ভেনদেত্তা—রাজা জেমস-এর আত্মীয়রা রাজাকে হত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। রোক্কা থামল।

আর রানী ইসাবেলা ও রাজকুমারী? ফ্রান্সিস বলল।

রানী ইসাবেলা রাজা জেমসের মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দুর্গরক্ষীদের আদেশ দিলেন ঐ ঘর দুটি থেকে নামার সিঁড়িটা ভেঙে ফেলতে। রক্ষীরা অবাক হয়ে গেল। ওরা বুঝল না—রানী ইচ্ছে করে কেন এভাবে নিজেকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিচ্ছেন। রানী ক্রুদ্ধ হলেন। আবার জোরের সঙ্গে আদেশ দিলেন। অগত্যা দুর্গরক্ষীরা লোহার বড় বড় শাবল সংগ্রহ করে সিঁড়ির পাথরগুলোর খাঁজে খাঁজে চাড় দিয়ে সিঁড়িটা সম্পূর্ণ ভেঙে দিল। রানীও সিঁড়িতে নামার কাঠের দরজাটা চিরদিনের জন্যে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। দেখলে মনে হবে দুটি ঘরই যেন শূন্যে ঝুলছে। আপনারা পালাচ্ছিলেন, কাজেই ঘর দুটো লক্ষ্য করেননি। রোক্কা থামল।

আর সেইসব রত্নালংকারগুলো? ফ্রান্সিস বলল।

ঐ দুটো ঘরের কোথাও আছে হয়তো। রোক্কা বলল।

হয়তো বলছেন কেন? হ্যারি বলল।

একটা ঘরের একটিমাত্র গরাদ দেওয়া জানলা আছে। পশ্চিমদিকে খাড়া দুর্গের দেওয়ালের গায়ে। এত উঁচুতে যে মাটি থেকে ওখানে ওঠা অসম্ভব। কাজেই ঐ ঘর দুটোয় যাওয়া এবং খোঁজ করার কথা কেউ কল্পনাও করে না। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দুর্গের ওপরটা যতটা দেখেছি তাতে বলতে পারি ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে বোধহয় ঐ জানালাটায় পৌঁছানো যায়। রোক্কা বলল, হ্যাঁ আমি শুনেছি পরে নাকি সিনার্কার নির্দেশে দু'জন দু'বার ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে জানালার লোহার গরাদ ভেঙে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দু'জনই জানালায় গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রানী ইসাবেলা ছোরা মেরে দু'জনকেই ফেলে দিয়েছে নিচের পাথরের চত্বরে। দু'জনেই শেষ।

তারপরেও কি ওভাবে চেষ্টা করা হয়নি? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ হয়েছে—অনেক বছর পরে। সেই লোকটা জানালার কাছে এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। তখনই জানালার ওপর থেকে বড় পাথরের টুকরো খসে পড়েছিল ওর মাথায়। লোকটা তীর খাওয়া পাখির মতো খসে পড়েছিল জানালা থেকে। তারপরেও হয়তো লুকিয়ে- চুরিয়ে কেউ কেউ চেষ্টা করে থাকবে। হাজার হোক অত মূল্যবান রত্নভাণ্ডার। কিন্তু কেউ গরাদ ভেঙে ঢুকতে পারেনি। গরাদসহ জানালাটা এখনও অটুট আছে। রোক্কা থামল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোনো কথা বলল না। তিন জনেই সমস্ত ঘটনাটা ভাবছে তখন। একসময় ফ্রান্সিস বলল, দুর্গটা, জানালাটা ভালো করে দেখতে হবে। কিন্তু দেখতে গেলে তো আবার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। আমরা তো বিদেশী।

পারবেন ঐ ঘর দুটোয় ঢুকতে? রোক্কা হেসে বলল।

সব দেখেটেখে ভেবে নিয়ে বলতে পারব। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে সিনার্কাকে একবার বলে দেখতে পারেন। সিনার্কা যা অর্থপিশাচ আর লোভী ও আপনাকে ঠিক খোঁজ খবরের অনুমতি দেবে। রোক্কা বলল। হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস? চেষ্টা করবে নাকি? ফ্রান্সিস হেসে একবার মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল, হ্যারি, অনেক অভিযানেই বেরিয়েছি বাবার অনুমতি তো নয়ই—মার অনুমতিও নিইনি। আজ কিন্তু আমি হার স্বীকার করছি। মারিয়ার অনুমতি পেলে তবেই রত্নভাণ্ডারের উদ্ধারে যাব। মারিয়া হেসে বলল, আমি জানি আমি মানা করলে তুমি মনে কী তীব্রণ কষ্ট পাবে। তুমি চেষ্টা কর—আমাকে তো দু'তিন দিন বিশ্রাম নিতেই হবে। ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—সত্যি মারিয়া, তুমি আমার মনোভাবটা খুব সহজেই বুঝতে পারো।

রোক্কা বলল, ফ্রান্সিস, আপনি চেষ্টা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে ঐ ঘর দুটোকে বলে ভূতের ঘর। অনেক অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও সিনার্কারা কাউকে ওই জানালার কাছেও পাঠাতে পারেনি। অনেকে রাতের বেলা ঐ জানালায় মোমের অস্পষ্ট আলো দেখেছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল, ওসব ভূতটুতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমার ভয়টা একটু কমই। আসল কথা সব কিছুকেই আমি গভীরভাবে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ভাবি এবং সত্য উদ্‌ঘাটন করি। সব কথাই যাচাই করে নিতে হয়।

পরদিন সকালে মারিয়া অনেকটা সুস্থ হলো। ঘরে পায়চারি করল। ফ্রান্সিস তাই দেখে বলল, মারিয়া এবার তাহলে নিশ্চিন্তমনে সিনার্কার দরবারে যেতে পারি। মারিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখ আমি যেতে পারলাম না।

তাতে কি। কাজে লাগলে তুমি থাকবে তখন। ফ্রান্সিস বলল। রোক্কা তখনই হ্যারিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল ফ্রান্সিস বেরোবার জন্যে তৈরি। রোক্কা বলল, বিদেশী, আপনাদের দেখলে সিনার্কার সৈন্যরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করবে।

আমি সেটাই চাই। তাহলে সিনার্কার দরবারে যাওয়ার সুবিধেই হবে। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

রোক্কা বলল, সাবধান, আপনারা আমাকে চেনেন একথা কিন্তু কক্ষণো বলবেন না। ফ্রান্সিস বলল, ওটা আমার আগেই ভাবা হয়ে গেছে। হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস রাস্তায় নামল।

সিনার্কার প্রাসাদটা কোথায় সেটা রোক্কা বলে দিয়েছিল। ফ্রান্সিসরা নির্বিঘ্নেই প্রাসাদের কাছে এল। রাস্তার লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছিল। কিন্তু কোনো সৈন্যের নজরে তখনও পড়েনি ওরা। এবার পড়ল। প্রাসাদের কাছেই তিন চারজন সৈন্য ছুটে এল ওদের দিকে। সৈন্যরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, আমরা ভাইকিং বিদেশী। আমাদের জাহাজ ডুবি হয়েছে তাই রাজা সিনার্কার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। আমাদের রাজার দরবারে নিয়ে চলো। বেশ দৃপ্তভঙ্গিতেই হ্যারি কথাগুলো বলল। একটু ঘাবড়েই গেল সৈন্যরা। একজন বলল, ঠিক আছে চলো।

পাথর আর কাঠের তৈরি প্রাসাদ খুব বড় নয়। পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সদর দেউড়ির কাছে প্রাসাদরক্ষীরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। দেউড়ির কাছে এসে ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বললো, হ্যারি, সেই দলপতি তো আমাদের দেখলে চিনে ফেলবে। হ্যারিও ফিসফিস করে বলল, সেই দলপতি এখন হাঁটুর ঘা নিয়ে বিছানায় চিৎ।

মানে? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল। হ্যারি তখন অল্পকথায় শাঙ্কোর তীর ছোঁড়ার ঘটনাটা বলল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো।

সিনার্কার দরবারকক্ষটা বেশি বড় নয়। জানালা বেশি থাকায় ঘরে বেশ আলো। একটা কাঠের সিংহাসন মতো। তাতে নানারকম নকশা খোদাই করা মখমলের আসনে রাজা সিনার্কা বসে আছে। সিনার্কাকে ফ্রান্সিস আগে দেখেছে। এখন দেখল নানারঙের ফুলপাতা তোলা গাঢ় নীল একটা ঢোলাহাতা পোশাক সিনার্কা পরে আছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। তিনকোণা একটা সোনার মুকুট মাথায়। বিচার চলছিল। ফ্রান্সিসদের একটুক্ষণ দাঁড়াতে হলো।

বিচারের রায় শুনে খুশি হয়ে একজন মাথা নুইয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল। অন্যজনকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেল। এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। সৈন্যটি কিছু বলার আগেই হ্যারি একবার মাথা একটু নুইয়ে বলতে লাগল, মান্যবর রাজা, আমরা বিদেশী ভাইকিং। এ আমার বন্ধু ফ্রান্সিস—আমি হ্যারি। এখানে এসে শুনলাম বোনিফেসিওর দুর্গটার দুটি কক্ষে রাজা দ্বিতীয় জেমস-এর রানী ইসাবেলার কিছু রত্নালংকার নাকি আছে। আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা চেষ্টা করতে পারি সেই রত্নালংকারগুলো উদ্ধার করতে। বিনীত অনুরোধ—বন্ধুটিকে যা বলার স্প্যানীয় ভাষায় বলবেন। ও লো ল্যাতিন ভাষা জানে না। হ্যারি থামল। রাজা একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, পারবে তুমি উদ্ধার করতে?

সব দেখেটেখে ভেবে তবেই বলতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ওটা ভুতুড়ে ঘর। কয়েকজন লোক ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে মারা গেছে তা জানো? সিনার্কা বলল।

জানি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ—চেষ্টা করো। সিনার্কা বলল।

তাহলে আপনি সবাইকে আদেশ দিন, কেউ যেন আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা না দেয়। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ আদেশ দেওয়া হবে। সিনার্কা বলল। তারপর একটু ভেবে হঠাৎ সিনার্কা বলে বসল, রত্নালংকারগুলো পেলে কিন্তু সব আমাকে দিতে হবে। রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তোমাদের হত্যা করা হবে। ফ্রান্সিস মাথা দুলিয়ে বলল—বেশ। তবে আমরা পালাবো না।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে দুর্গটায় এল। রক্ষীরা কেউ ওদের বাধা দিল না। দুর্গের পাথুরে চত্বর দিয়ে ওরা পশ্চিম দিকে এল। দেখল, অনেক উঁচুতে সেই গরাদ দেওয়া জানালাটি। দুজনেই বেশ মনোযোগ দিয়ে জানালাটা দেখল। ঐ জানালাটার পরেই দুটো ঘর। প্রায় একশো বছরের মধ্যে কেউ ঐ ঘর দুটোয় ঢুকতে পারেনি। এবার ওরা দুর্গটার মধ্যে ঢুকল বড় প্রবেশপথটা দিয়ে। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। এপাশে ওপাশে ঘর আছে। সৈন্যদের আস্তানা। একেবারে শেষে সিঁড়ি শেষ। হাত কুড়ি দূরে একটা কাঠের বন্ধ দরজা। ওরা বুঝল এটাই সেই দরজা দুটো ঘরে যাওয়ার। রানী ইসাবেলা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই দরজাটা। নিচের দিকে তাকিয়ে ওদের মনে হলো ঘরটা যেন ঝুলছে। ফ্রান্সিস চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ঐ দরজাটার কাছে যাওয়ার উপায় আছে কিনা। দেখল, কোনো উপায় নেই। থাকলে অনেক আগেই দরজা ভেঙে সব উদ্ধার করা হতো। ওপরে তাকিয়ে দেখল পাথুরে ছাদটাও অনেক উঁচুতে। দুজনেই নেমে এল।

সেই জানলাটার নিচে এল ফ্রান্সিস। হ্যারিও এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে জানালাটা, দুর্গের মাথাটা দেখল। তারপর বলল, শাঙ্কো যেমন করে পেছন দিয়ে উঠেছিল সেভাবেই দুর্গের মাথায় উঠতে হবে।

ঘরে ফিরে এল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। রোক্কা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। মারিয়া আজ অনেক স্বাভাবিক। একটু দুর্বলতা আছে অবশ্য। ফ্রান্সিস সব বলল দুজনকে। তারপর বলল, একটা কথা বুঝলাম যে জানালাটায় কোনোরকম ধাক্কা দেওয়া চলবে না, মানে জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে। কথাটা ঠিক কি না কালকে জানালাটার কাছে গিয়ে বুঝবো।

জানালার কাছে যাবে কি করে? মারিয়া বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল।

কেন তোমাকে তো হীরের পাহাড়ের গুহায় ঢোকার ঘটনাটা বলেছিলাম মনে নেই? ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়া মনে করার চেষ্টা করে বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমেছিলে।

পরের দিন সকালের দিকে ফ্রান্সিস তৈরি হলো। ফ্রান্সিসের নির্দেশমতো হ্যারি বর্গ পাহাড়ের আস্তানা থেকে শাঙ্কো, বিস্কো আর আট-দশজন ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে তখনই বৈদ্যমশাইয়ের বাড়িতে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, শাঙ্কো, কাছি দড়ি এনেছিলে সেদিন—সে সব কোথায় রেখেছো?

ঐ দুর্গের পেছনে খাদেই রেখেছি সব। শাঙ্কো বলল।

ঠিক আছে। চলো সব। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া তখন বিছানায় বসে বসে সকালের খাবার খেয়ে নিয়েছে। ওষুধও খেয়েছে। মারিয়া বলল, আমিও যাবো। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকালো। দেখল—মারিয়ার মুখচোখ অনেক সতেজ এখন। বলল, মারিয়া তোমার হেঁটে যেতে কষ্ট হবে।

না-না, আমি যেতে পারবো। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, মারিয়া অনেক কষ্টে তোমাকে বাঁচিয়েছি। আবার বিপদে পড়তে চাই না। তখনই পাশে দাঁড়ানো রোক্কাকে হ্যারি বলল, রোক্কা, একটা শস্যটানা শকট যোগাড় করে দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই। রোক্কা চলে গেল। একটু পরেই একজন চালক একটা শস্যটানা শকট নিয়ে এল। শকটটাতে একটা ঘোড়া জোতা। হ্যারি আর মারিয়া গাড়িটায় উঠল। আস্তে আস্তে চলল শকটটা। পেছনে ফ্রান্সিস আর ভাইকিং বন্ধুরা।

দুর্গের সামনে পৌঁছল ওরা। দেখল—বেশ ভিড় জমে গেছে। বোনিফেসিওর লোকজন তখনও আসছে। সিনার্কা তখনও আসেনি।

বন্ধুদের দুর্গের জানালার নিচে অপেক্ষা করতে বলে ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের পেছনের খাদটায় এল। দেখল—শাঙ্কোর বাঁধা লম্বা কাছিটা তেমনি বাঁধা আছে। পড়ে থাকা দড়িটার একটা মুখ শাঙ্কো কোমরে বেঁধে নিল। কাছি বেয়ে বেয়ে তিনজনেই দুর্গের পেছনের স্তূপাকার খসে পড়া পাথরের স্তূপের ওপর উঠে এল। পাথরের



চাইয়ের সঙ্গে বাঁধা কাছিটার মুখটা ফ্রান্সিস খুলে নিল। কাছির মুখটা কোমরে বেঁধে নিল। তিনজন এবার খুব সাবধানে ভাঙা পাথরের ওপরে পা রেখে রেখে চলল দুর্গের মাথার দিকে। দু'জায়গায় পাথর নড়ে গিয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পড়লে গড়িয়ে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়তো। কোনোরকমে ভারসাম্য রাখল।

তিন জনেই আগে পরে করে দুর্গের মাথায় উঠে এল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল যেন মেলা বসে গেছে—এত লোক। ওদের দুর্গের মাথায় দেখে নিচের ভিড়ের মানুষেরা চিৎকার হৈহৈ শুরু করে দিল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল—সেই কালোকাঠের ছাদখোলা শকটটায় চড়ে সিনার্কা দুর্গের চত্বরে ঢুকল।

এবার ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দু'তিনটে বড় বড় পাথরের পাটামতো পড়ে আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ঐ পাটাতন-গুলোর সঙ্গে দড়ির মুখটা বাঁধতে বলল। তিনজনে মিলে চেপে বাঁধল দড়িটা। দড়িটার অন্য মুখটা ফ্রান্সিস দুর্গের মাথা থেকে ঝুলিয়ে দিল। দড়ির সেই মুখটা দুর্গের পাথুরে দেয়ালের গা দিয়ে নেমে এল জানালাটার কাছে। ফ্রান্সিস দড়িটা বার কয়েক টেনে দেখল। তারপর দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ল। পাথুরে দেয়ালে পায়ের ভর রেখে রেখে ফ্রান্সিস জানালাটার সামনে এল। কিন্তু জানালার লোহার গরাদ ধরল না। দেয়ালে পা রাখল। কারণ রোজা বলেছিল দু'জন লোক জানালার গরাদ ধরে টেনেছিল। জানালার মাথা থেকে আলগা পাথর খুলে পড়েছিল আর দু'জনই মাথা ফেটে মারা গিয়েছিল। ফ্রান্সিস দু'পা দিয়ে দড়ি আঁকড়ে ধরে কোমরে বাঁধা কাছির মুখটা বের করল। খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে গরাদগুলোর মধ্যে দিয়ে কাছির মুখটা ঢুকিয়ে বেশ শক্ত গেরো দিল। তারপর দড়ি বেয়ে বেয়ে দুর্গের মাথায় উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শাঙ্কো কাছির অন্য মুখটা নিচে ফেলে দাও। শাঙ্কো কাছির অন্য মাথাটা টেনে আনল। তারপর দুর্গের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিল। কাছির মাথাটা চত্বরে গিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তখন নিচে দাঁড়ানো ভাইকিং বন্ধুদের কাছিটা টানার ইঙ্গিত করল। এবার বন্ধুরা বুঝল—ফ্রান্সিস কাছি টেনে জানালার গরাদগুলো ভেঙে ফেলতে বলছে। ভাইকিংরা কাছির মুখটা টেনে ধরল। তারপর মুখে শব্দ করে একসঙ্গে সবাই জোরে টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার মাথা থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো বৃষ্টির মতো নিচে ছিটকে পড়ল। ধুলো বালি উড়ল। ফ্রান্সিস বুঝল—রানী ইসাবেলা কোনোভাবে জানালার মাথার পাথরগুলো আলগা করে রেখেছিলেন যাতে কেউ জানালার গরাদে এসে দাঁড়াতে না পারে। পাথর পড়তে দেখে নিচের লোকজন ভয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। আবার ভাইকিংরা মুখে হো হো শব্দ করে একসঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিতে লাগল। বারকয়েক টানতে হঠাৎ শব্দ তুলে গরাদগুলো ভেঙে গেল। ছিটকে নিচে পড়ল। ভাইকিংরা দ্রুত সরে গেল। বাঁ পাশের একটা গরাদ ভাঙলো না বাঁধা ছিল না বলে।

এবার ফ্রান্সিস আগের মতো দড়ি বেয়ে বেয়ে জানালার কাছে এসে জানালার নিচের অংশে পা রাখল। দেখল একটু কাত হয়ে অনায়াসে ঘরটায় ঢোকা যাবে। ও শরীর একটু বেঁকিয়ে কাত হয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় ঢুকল।

নিচে সিনার্কা মারিয়া ভাইকিংরা ভিড়-করা বোনিফেসিওর লোকেরা সাগ্রহে তাকিয়ে রইল ঐ ভাঙা জানালাটার দিকে।

চারদিক নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই ভিড়ে জটলায়। শুধু সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস ভাঙা জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়াল। নিচের ভিড়ে চিৎকার হৈ হল্লা শুরু হলো। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ঝুলন্ত দড়িটা ধরল। তারপর বেরিয়ে এল জানালা দিয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসের হাতে কিছুই নেই। বোনিফেসিওর লোকেরা হতাশ হলো। ওরা আশা করেছিল প্রায় একশো বছর যাবৎ প্রচলিত লোকমুখে শোনা রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার ঐ দুঃসাহসী বিদেশীটা উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু ওর হাতে কোথায় সেই

ফ্রান্সিস জানালাটার সামনে এল

রত্নভাণ্ডারের পেটিকা? মারিয়ার মনে ভাইকিংদের মনে শুধু একটাই চিন্তা—তাহলে ফ্রান্সিস কি এবার ব্যর্থ হলো? এই প্রথম হার স্বীকার করল?

দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিস আগের মতো দুর্গের মাথায় উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে নিচের ভিড়ের দিকে আসতে লাগল। দেখেই বোঝা গেল ওরা ব্যর্থ। ফ্রান্সিস সিনার্কার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে বলল, মাননীয় আমি চেষ্টা করেও রত্নভাণ্ডারের পেটিকা ঐ ঘর দুটোয় পেলাম না। কথাটা অনেকেই শুনতে পেল। বাকিরা জিজ্ঞেস করে তাদের কাছ থেকে জানল। ভিড় জটলা ভেঙে গেল। হতাশায় বোনিফেসিওর অধিবাসীরা কথা বলতে বলতে চলে গেল। সিনার্কা কিছু বলল না। রত্নভাণ্ডার পেল না। অর্থলোভী সিনার্কা খুব আশা করেছিল—রত্নভাণ্ডার পেলে কিছু বিক্রি করে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে। জেনোয়া থেকে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে রোক্কার বিদ্রোহী সঙ্গীদের লড়াই করে হারিয়ে দেবে। হতাশ সিনার্কা আস্তে আস্তে গিয়ে শকটে উঠল। শকট চলল রাজবাড়ির দিকে।

মারিয়া আর হ্যারি গিয়ে উঠল শমাটানা গাড়িটায়। ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস পেছনে পেছনে চলল বৈদ্যমশাইয়ের বাড়ির দিকে।

সন্ধে পর্যন্ত ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল। মারিয়া আর বন্ধুরাও ফ্রান্সিসকে বিরক্ত করল না। রোক্কাও কিছু জিজ্ঞেস করল না।

যুবকটি অন্ধকার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে বসল। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, সুন্দর মীনে করা রত্নপেটিকা আমি দেখেছিলাম। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—এত কষ্টে পাওয়া রত্নপেটিকা। নিয়ে এলে না কেন? অন্য বন্ধুরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, সত্যিই তো? শুধু হ্যারি আর মারিয়া কোনো কথা বলল না। রোক্কা বেশ আশ্চর্য হলো। বলল, পেয়েও আনলেন না কেন?

ফ্রান্সিস একটু ম্লান হাসল। বলল, সব বলছি—শুনুন। ফ্রান্সিস একটু থেমে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—জানালার নিচের অংশে পা রেখে একটু দম নিলাম। ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। যেটুকু আলো জানালা দিয়ে আসছে তাতে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু থামল ফ্রান্সিস। তারপর বলতে লাগল, জানালা থেকে আস্তে আস্তে মেঝেয় পা রাখলাম। তখন ভাবলাম—প্রায় একশো বছর পরে বাইরের কোনো মানুষ এই ঘরের মেঝেয় পা রাখলো। অন্ধকারটা তখন চোখে অনেকটা সয়ে এসেছে। ডান দিকের পাথুরে দেয়ালে দেখলাম—লাল রঙের পাথর ঘষে ঘষে ছোটো ছোটো লম্বাটে অনেকগুলো দাগ। বুঝলাম রানী ইসাবেলা এভাবেই দিনের হিসেব রেখেছিলেন। সামনের পাথুরে দেয়াল ঘেঁষে একটা খাট পাতা। ধুলো জমে জমে খাটের কাঠ বিছানা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। তবু বুঝলাম—খাটটা দামী এক কাঠের। ধুলোভরা কাঠের গায়ে নানা ফুলপাতার কারুকাজ। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল, আস্তে আস্তে খাটটার কাছে গেলাম। অস্পষ্ট দেখলাম খাটের ফুটোফাটা বিছানার মাঝখানে ধুলো ময়লা ঢাকা একটা কাঠের বাক্স। কাঠের গায়ে মীনে করা ফুলটুলি লতাপাতা। বুঝলাম—এটাই রানীর ইসাবেলার রত্নপেটিকা—রত্নভাণ্ডার। ভালো করে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। সাদা হাড়ের ধূলিময় দুটো হাত যেন রত্নপেটিকাটা ধরে আছে। এসব ধুলো ময়লার মধ্যে দিয়ে আন্দাজ করে বুঝলাম—দুটো নরকঙ্কাল। একটি বড় অন্যটি ছোটো। এটাও বুঝলাম রানী ইসাবেলার ও রাজকুমারীর কঙ্কাল। জানি না দু'জনেই একসঙ্গে মারা গিয়েছিলেন কিনা। তবে মৃত্যুর মুহূর্তেও হাত দিয়ে তাঁরা ধরে রেখেছিলেন রত্নভাণ্ডার। আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কী গভীর ভালোবাসায় মৃত্যুর সময়ও ঐ রত্নপেটিকা তাঁরা হাতছাড়া করেননি। কী যে হলো। বড় মমতায় রাখা দু'জনের হাত সরিয়ে সেই রত্নপেটিকা আমি নিতে পারলাম না। আস্তে আস্তে জানালার কাছে চলে এলাম।

সকলেই চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। একসময় রোক্কা এসে আবেগে দু'হাতে ফ্রান্সিসের হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, ফ্রান্সিস, যদিও রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলো না—তবু আমি আপনার মানবতাবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনি সত্যি সাধারণ মানুষ নন।

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল, কী যে বলেন!

মারিয়া মৃদুস্বরে বলে উঠল, রোক্কা ঠিক আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন। আর কেউ কোনো কথা বলল না।

পরদিন সকালে বর্গ পাহাড়ের আস্তানা থেকে বাকি বন্ধুরাও এল। ওরাও শুনল ফ্রান্সিসের এই ঘটনা। এতে কেউ কিছু দুঃখিত হলো না। বরং ফ্রান্সিস বন্ধু হলেও ওর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

রোক্কার কাছে বিদায় নিল ফ্রান্সিস। এবার মারিয়াকে নিয়ে সবাই চলল জাহাজঘাটের দিকে। রাস্তায় দু'পাশের বাড়িঘর থেকে বোনিফেসিওর লোকজন ভাইকিংদের দলের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ করে প্রায় সকলেরই দৃষ্টি ফ্রান্সিসের ওপর। লোকটা রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারেনি কিন্তু ওর দুঃসাহসের তুলনা নেই।

জাহাজে উঠল সবাই। সারা দুপুর বিশ্রাম করল। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিসের নির্দেশে নোঙর তোলা হলো। পালগুলো খুলে দেওয়া হলো। বেগবান বাতাসে ফুলে উঠল পালগুলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলল মাঝ-সমুদ্রের দিকে।

ছবি : বিজন কর্মকার

অ-আ-ক-খ

✱ মুস্তাফা নাশাদ

অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে,
পড়িস যে খুব মাথা নেড়ে!
সহজ সরল এমন ভাষা,
ছিল না রে পাপন, পাশা।

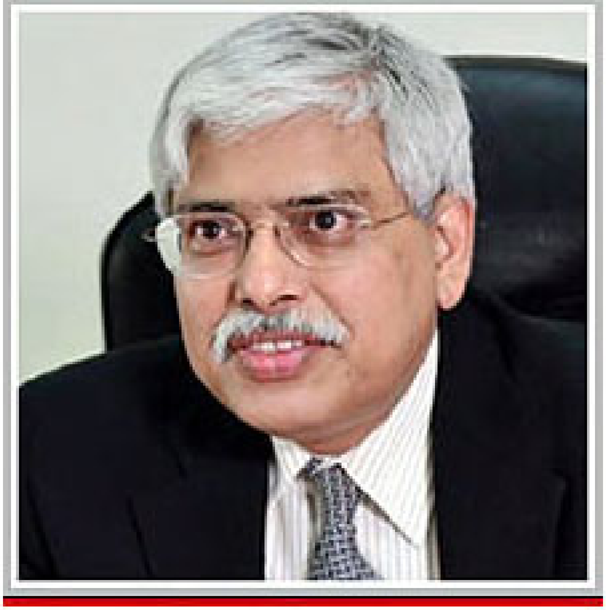
আ-য়ে আনারস পড়িস শুনি,
কার কৃপায়, কোন সে গুণী?
কে সাজালেন কথামালা,
'বর্ণপরিচয়'-এর ডালা?



ক-য়ে কিরণ বলল হেসে,
কচি-কাঁচায় ভালোবেসে,
বিদ্যাসাগর মহাশয়—
লেখেন 'বর্ণপরিচয়'!

খ-য়ে খ্যাতির শীর্ষচূড়ে
বাংলা এখন বিশ্বজুড়ে,
তাঁর সুবাদে করছে বিরাজ—
জানে যোসেফ, সুধীন, সিরাজ।

ছবি : সুফি



অনিল ভৌমিক এর জন্ম হয় ১৯৩২ সালের ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তাঁর বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন কেটেছিল ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার সময় তিনি দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে পেশাগত জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি এই চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলে এমএ বিটি। তিনি আকাশবাণীতে বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ লিখেছেন। 'পরাশর রায়' এই ছদ্মনামে তিনি আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। তিনি একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। তিনি মূলত তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্য বিখ্যাত।